অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
গোঁসাইবাগানের ভূত

গোঁসাইবাগানের ভূত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

‘রা-স্বা’
সুমিকে
—বাবা

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
অষ্টপুরের বৃত্তান্ত
উঁহু
কিশোর উপন্যাস সমগ্র (১-৪)
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোলমেলে লোকে
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
জং বাহাদুর সিংহর নাতি
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ঝিলের ধারে বাড়ি
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
দুধসায়রের দ্বীপ
নন্দীবাড়ির শাঁখ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
নৃসিংহ রহস্য
পটাশগড়ের জঙ্গলে
পাগলা-সাহেবের কবর
পাতালঘর
বক্সার রতন
বটুকবুড়োর চশমা
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভুতুড়ে ঘড়ি
ভেলু যখন রাজা হল
মদন তপাদারের বাক্স
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
মোহন রায়ের বাঁশি
রাঘববাবুর বাড়ি
যোলো নম্বর ফটিক ঘোষ
সর্বনেশে ভুল অঙ্ক
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হাবু ভুঁইমালির পুতুল
হিরের আংটি
হেতমগড়ের গুপ্তধন

কিছু ভুতুড়ে কথা

এই উপন্যাসটি শারদীয় 'আনন্দমেলা'-য় প্রথম বেরোনোর পরই অনেকে প্রশ্ন তুলেছিল, রামনামকে ভূতের যদি এতই ভয়— তবে ভূতের নিজের নাম কেন নিধিরাম? ভারি শক্ত প্রশ্ন। মাথাটাকে চুলকে আমি তখন বোঝালাম, নামের 'রাম' আর 'রামনাম' তো এক নয়! নিধিরামের যে রাম, তার সঙ্গে দশরথের বড় ছেলের সম্পর্ক নেই কোনো। তাছাড়া সাপের বিষ কি সাপকে লাগে? তারপর ফের প্রশ্ন উঠল, তাই যদি হবে তবে রাম কবিরাজের নাম শুনে ভূত পালায় কেন? সেও তো নাম। আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, তা বটে। তবে কিনা কবিরাজ মশাইয়ের নামটা একেবারে সোজাসুজি রাম, তার আগে বা পরে কিছু যুক্ত নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল, ভূতের মনস্তত্ত্বও বোঝা ভার। কখনো তারা রামনাম শু'নে আঁতকে ওঠে, কখনো কোনো কোনো রামকে তারা কেয়ারই করে না। আবার ধরো না কেন, কোনো ভূত যদি ভুল করে বে-খেয়ালে রাম কবিরাজের নাম করেই বসে, তাহলে আমাদের কী করার আছে? ভূতেরও তো ভুল হয়! পুরো ব্যাপারটাই ভারি গণ্ডগোলের। আমি তাই লেখাটা শোধরালাম না। রামনাম আর রামের নাম নিয়ে গণ্ডগোল সহ-ই বইটা ছাপা হল। তোমরা বরং কোনো ভাল ভূত পেলে তার কাছ থেকে সত্যি কথাটা জেনে নিও।

বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে তেরো পেয়ে বুরুন একেবারে বোকা বনে গেল। সে ইতিহাসে আশি, বাংলায় পঁয়ষট্টি, ইংরিজিতে ষাট এরকম সব নম্বর পেয়েছে, কিন্তু অঙ্কে তেরো।

হেডমাস্টারমশাই শচীন সরকার বরিশালের লোক। যেমন তেজী তেমনি রাগী। তা বলে ছেলেদের মারধর করেন না। কিন্তু তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালে সমস্ত স্কুলটায় ছুঁচ পড়লে শব্দ শুনতে পাবার মতো অবস্থা। তিনি প্রত্যেকটি ছাত্রকে ভাল চেনেন, প্রত্যেকের নাম-ধাম স্বভাব-স্বাস্থ্য-অভ্যাস সব তাঁর নখদর্পণে। রেজাল্ট বেরোলে বুরুনকে ডেকে তিনি বললেন, "যে ছেলে গণিত জানে না, সে বড় হয়ে কী হয় জানো? বেহিসাবী, অমিতব্যয়ী আর আন্‌প্রাকটিক্যাল। গণিতের শিক্ষা মানুষের বনিয়াদকে শক্ত করে দেয়। মন এবং চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ হয়। ভাবপ্রবণতা কমে যায়। যে গণিতের শিক্ষা ঠিকমতো করেনি, আমার মতে সে ভাল ছেলে নয়।"

বাড়িতে ফিরতে বাবা বুরুনকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। বাবা অসম্ভব রাশভারী লোক। ভাল ডাক্তার বলে তাঁর খুব নামডাক। খুব ব্যস্ত মানুষ, নিজের ছেলেমেয়েদের খোঁজখবর করবার তাঁর বড় একটা সময় হয় না। বলতে কী, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি খুবই কম কথা বলেন। প্রয়োজন না হলে একনাগাড়ে সাত-আট দিন পর্যন্ত কথাই বলেন না। তাই বুরুন এবং তার ভাই-বোনরা বাবাকে এক রহস্যময় মানুষ বলে জানে। সামনে যেতে ভয় পায়।

বুরুন যখন বাবার ঘরে গেল, বাবা তখন জানালার ধারে ইজিচেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছেন। গলার স্টেথোস্‌কোপ এবং গায়ের পোশাক ঠিকঠাক আছে। অর্থাৎ এক্ষুনি রোগী দেখতে বেরোবেন। বুরুন ঘরে ঢুকতেই বাবা হাত বাড়িয়ে বললেন, "প্রোগ্রেস রিপোর্টটা দেখি।"

বুরুন ভয়ে-ভয়ে ভাঁজ করা কাগজটা হাতে দিতে, বাবা ভ্রূ কুঁচকে খুব বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে দেখলেন নম্বরগুলো। তারপর কাগজটা ফেরত দিয়ে বললেন, "আমিও ছাত্রজীবনে অঙ্কে খুব ভাল ছিলাম না। কিন্তু আশি-নব্বই না পেলেও চল্লিশ-পঞ্চাশ পেতে অসুবিধে হত না।"

বুরুন মেঝের দিকে চেয়ে রইল।

বাবা উঠতে উঠতে বললেন, "কাল থেকে করালী মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে রোজ পড়তে যাবে। হেঁটে যাবে। হেঁটে আসবে।"

করালী মাস্টারমশাই থাকেন আড়াই মাইল দূরে কামরাডাঙায়। বোজ সেখান থেকে সাইকেলে ইস্কুলে আসেন। অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রচণ্ড নাম-ডাক। তিনি নাকি খাওয়ার শেষে ভাতের থালায় আঙুল দিয়ে অঙ্ক করেন, বড় বড় সব অঙ্কের স্বপ্ন দেখেন, লোকে যেমন গল্প-উপন্যাস পড়ে, করালী স্যার ঠিক তেমনিভাবে অঙ্কের বই পড়েন। লোকে যেমন দুঃখের গল্প পড়ে কাঁদে, হাসির গল্প পড়ে হাসে বা ভূতের গল্প পড়ে ভয় পায়, করালী স্যারও নাকি তেমনি অঙ্কের মোটা মোটা বই পড়তে পড়তে কখনো হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন, কখনো বা খুচ-খুচ করে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মোছেন, আর কখনো কোনো ভুল অঙ্ক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠে "রাম রাম রাম রাম" করতে থাকেন। ভারি আপনভোলা মানুষ। ছাত্রদের কারো নাম তাঁর মনে থাকে না। কারো বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার পর যদি কেউ জানতে চায় "করালীবাবু, রুই মাছটা কেমন খেলেন?" করালীবাবু ভারি অবাক হয়ে বলেন, "রুইমাছ! রুইমাছ ছিল নাকি?" একবার পায়েস খাওয়ার পর ঢেঁকুর তুলে বলেছিলেন, "দইটা অতি চমৎকার। এত মিষ্টি দই খাইনি।" অঙ্কের ওরকম দিক্‌পাল শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও কালীবাবু কিন্তু পয়সাকড়ির হিসেবে ভারি কাঁচা। এক টাকা চার আনা কেজির উচ্ছের আড়াইশো গ্রামের দাম কত হয়, তা বাজারে গিয়ে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারেন না। অসহায়ভাবে দোকানদারকেই বলেন, "বাবা, তুমিই হিসেব-টিসেব করে পয়সা গুনে রাখো। আমি অঙ্কে ভারি কাঁচা।"

আড়াই মাইল দূরে করালীবাবুর বাড়িতে রোজ অঙ্ক শেখার জন্য হেঁটে যাতায়াত করতে হবে জেনে বুরুনের ভারি রাগ হচ্ছিল।

সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বাবা বললেন, "কষ্ট না করলে মানুষ হওয়া যায় না। তোমরা বড় বেশি আদরে মানুষ হচ্ছ, তাই কোনো ব্যাপারেই তেমন গা নেই। রবীন্দ্রনাথ কত বড়লোকের ছেলে হয়েও চাকরদের মহলে মানুষ হয়েছেন। আমিও ঠিক করেছি, এবার থেকে তোমাদের আরাম আয়েস বিলাসিতা সব বন্ধ করে দেব। এখন থেকে অনেক কষ্ট করতে হবে তোমাদের। অঙ্ক শেখবার জন্য রোজ পাঁচ মাইল হাঁটা হল এক নম্বর কষ্ট। এর পর দু'-নম্বর, তিন নম্বর আরো বহু কষ্ট আছে। তৈরি থেকো!"

বলে বাবা বেরিয়ে গেলেন।

বুরুন অঙ্কে তেরো পাওয়ায় বাড়ির সবাই চুপচাপ, কেউ তার সঙ্গে বিশেষ কথা বলছে না। মা না, ছোট ভাই-বোন গুরুন আর বেলীও না। বেলীকে একবার পিঠ চুলকে দিতে বলেছিল বুরুন। বেলী জবাব দেয়, "তোমার সঙ্গে বেশি মিশতে বাবা বারণ করেছে। তুমি দেয়ালে পিঠ ঘষে নাও, তাতেই চুলকোনো হবে।"

বুরুন বুঝতে পারল বাড়ির লোক তাকে একঘরে করেছে।

পরীক্ষার পর ইস্কুল এখনো বসেনি। সারা দিনটা খুব ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা বারণ হয়ে গেছে। শুধু বিকেলে খেলাধুলো করার হুকুম আছে ঘণ্টা দেড়েকের জন্য। বুরুনের তাই মেজাজ অসম্ভব খারাপ। বাড়িতে একমাত্র দাদুই তার সঙ্গে আগের মতো কথাবার্তা বলেন, ভালও বাসেন। কিন্তু দাদুর সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটানোর উপায় নেই। তিনি দিনরাত কবিরাজি ওষুধ তৈরি করতে ব্যস্ত। দাদু কবিরাজির ধাতব আর ভেষজ দু' রকম চিকিৎসাই করেন। দিনরাত তিনি হিরেভস্ম, মুক্তাভস্ম, স্বর্ণসিন্দুর বানাচ্ছেন, মাঠে ঘাটে ঘুরে বেলগাছের মূল, কন্টিকারি, থানকুনি, আরো কত কী পাতা তুলছেন। তারপর

সেগুলো থেকে ওষুধ তৈরি করছেন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার ওপর তাঁর ভারি রাগ। নিজের ছেলে ডাক্তার বলে তিনি পাত্তাও দেন না। সন্ধেবেলা তাঁর বাজারের দোকানঘরে যখন বুড়োদের আড্ডা বসে, তখন সকলের সামনেই তিনি বলেন, "ভেলু আবার ডাক্তার নাকি! এখনো নাড়ী দেখতেই শিখল না!"

বাড়িতে বুরুন আজকাল বড় একা, অঙ্কে তেরো পেলে কী হয়, তা সে হাড়ে-হাড়ে বুঝছে আজকাল।

দুপুরবেলা বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেছে। বাবা কল পেয়ে শহরের বাইরে গেছেন। মা, গুরুন আর বেলী ঘুমোচ্ছে। দাদু আর শিবু চাকর উঠোনে হামানদিস্তায় শুকনো ভাঙপাতা গুঁড়ো করছে। তাদের বেজিটা ঘুরঘুর করছে সেখানে।

বুরুন তাদের পোষমানা পাখির খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ময়নাটা বলে উঠল, "বুরুন অঙ্কে তেরো পেয়েছে। বুরুন অঙ্কে তেরো পেয়েছে। বুরুন অঙ্কে—"

বুরুন ভারি অবাক হয়ে যায়। পাখিটাকে এ-কথা কবে কে শেখাল? পাখিটা খুবই চালাক, দু'-পাঁচবার শুনেই যে-কোনো কথা টপ করে শিখে নেয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কেউ ওকে এটা শিখিয়েছে বুরুনকে জব্দ করার জন্য।

পুরোপুরি জব্দ হওয়ার অবশ্য বাকিও খুব একটা নেই। বুরুনকে আজকাল তার নিজের ময়লা জামা-প্যান্ট নিজেকেই কাচতে হয়। নিজের এঁটো থালা বাটি গেলাস নিজেকেই মাজতে হচ্ছে। তাছাড়া আছে নিজের জুতো বুরুশ করা, নিজের বিছানা পাতা এবং মশারি টাঙানো, পড়ার ঘর সকাল-বিকেল ঝাঁট দেওয়া। বাড়িতে ভাই-বোন বা চাকর-বাকর কাউকে কোনো কাজের ফরমাস করা তার বারণ। এসব অপমান তবু গায়ে লাগে না, কিন্তু পোষা পাখির মুখে তার অঙ্কে তেরো পাওয়ার স্লোগান শুনে সে সত্যিকারের রেগে গেল। কটমট করে চেয়ে রইল পাখিটার দিকে। তারপর কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল।

শীতের দুপুর। ভারি উষ্ণ কোমল রোদ। পাড়ার মাঠে ছেলেরা ব্যাটবল খেলছে।

বুরুন আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ছোট গঞ্জমতো শহর ছাড়িয়ে একেবারে গোসাঁই ডাকাতের বাগানে এসে পড়ল।

গোঁসাই ডাকাতের বাগান বা গোঁসাইবাগান একটা বিশাল জঙ্গুলে জায়গা। জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়ি আছে, পুকুর আছে। আর আছে বুনো কুল আর বন-করমচার অজস্র গাছ। এরকম কুল আর কোথাও হয় না। দেখতে মটরদানার মতো ছোট, পাকলে ভারি মিষ্টি। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এত সাপখোপ, বিছুটির গাছ আর কাঁটাঝোপ যে, বুনো কুল খাওয়ার লোক জোটে না। পাখি-পক্ষীতেই খেয়ে যায়। যে গাছগুলো একটু নাগালের মধ্যে, সে গাছের ফল ধরতে না ধরতেই ছেলেরা দল বেঁধে এসে খেয়ে যায়। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে বেশি কেউ

যেতে পারে না বলে পুকুরের দক্ষিণ দিকটায় অবশ্য কুলগাছের কুল যেমন-কে-তেমন থাকে। মরসুম ফুরোলে ফল পড়ে মাটিতে আরো গাছ জন্মায়। জঙ্গল বাড়ে।

বুরুনের মন খারাপ। আর মন খারাপ থাকলে কত কী কাণ্ড বাধাতে ইচ্ছে হয়। যেমন এখন তার ইচ্ছে হল যেমন করেই হোক ওই দুর্গম জায়গায় গিয়ে খুব নিরিবিলিতে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকবে আর বুননা কুল খাবে। যদি সাপে কামড়ায়, তা হলে নাহয় মরবে। মরাই ভাল। যদি বিছুটি লাগে তো লাগুক। তার মনের মধ্যে যে অপমানের জ্বালা, তার চেয়ে বিছুটির জ্বালা আর এমন কী বেশি হবে।

বুরুন মনের দুঃখে বনে ঢুকল। ঢুকেই বুঝতে পারল, এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল পার হয়ে বুনো কুলের কুঞ্জবনে পৌঁছনো অসম্ভব। কাঁটা বা বিছুটি গ্রাহ্য নাহয় না-ই করল, কিন্তু এগোবার পথ চাই তো। যেদিক দিয়েই যেতে চেষ্টা করে, সেদিকেই ডালপালার রোগা-রোগা হাত বাড়িয়ে গাছ-গাছালি তার পথ আটকে ধরে।

একমাত্র উপায় হচ্ছে টারজানের মতো বড় গাছে উঠে এক গাছ থেকে ডাল ধরে ঝুল খেয়ে অন্য গাছের ডাল ধরে এগিয়ে যাওয়া। যদি গাছ থেকে পড়ে যায় তো যাবে। সেটা এমন কিছু দুঃখের হবে না তার কাছে। বরং বাড়ির লোক ভাববে, আহা, বুরুনকে আমরা কত কষ্ট দিয়েছি।

গাছ বাইতে বুরুন ওস্তাদ। একটা শিরীষ গাছে সে বানরের মতো উঠে গেল। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল একটা মোটা ডালের ওপর দিয়ে সে খানিক হেঁটে খানিক হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে পরের কদম গাছটার একটা ডাল ধরে ফেলল। মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ হাত উঁচুতে। এগিয়ে যেতে তেমন কোনো বাধা হচ্ছিল না বুরুনের। কেউ কোথাও নেই। শুধু শীতের কনকনে বাতাস বইছে। রোদের রঙে লালচে আভা। গাছ-গাছালিতে অজস্র পাখি আর পতঙ্গের ওড়াউড়ির শব্দ।

গাছের ডালের ঘষায় হাত-পায়ের নুনছাল উঠে গিয়ে জ্বালা করছে। একটা নিমগাছে বসে বুরুন একটু জিরোলো। তারপর আবার ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। পরিশ্রমে এই শীতেও ঘাম হচ্ছে। যত এগোচ্ছে, তত গাছপালা ঘন হচ্ছে। একেবারে গায়ে গায়ে সব গাছ। একটার ডালপালা অন্যটার ডালপালায় ঢুকে গেছে। এখন আর এক গাছ থেকে অন্য গাছে যেতে কষ্ট নেই। এক-একটা গাছে হেঁটমুণ্ডু হয়ে বাদুড়েরা ঝুলে আছে। কাঠবেরালী ডুমুর খাচ্ছে বসে। নীচের জঙ্গলে খড়মড় শব্দ করে একটা শজারু চলে গেল। বহু পাখির বাসা পার হল বুরুন। তার কোনোটাতে পাখির ডিম রয়েছে, কোনোটায় কুষি কুষি পাখির ছানা তাকে দেখে আতঙ্কে কিচমিচ করে ওঠে।

কুলগাছের কুঞ্জবনে পৌঁছতে বুরুনের কষ্ট হল বটে, কিন্তু এ-কাজ যে সে ছাড়া আর কেউ কখনো করতে পারেনি, তা ভেবে খুব একটা বাহাদুরির ভাবও এল মনে। একটা শিশু গাছের গা বেয়ে সে নীচের নিস্তব্ধ, নির্জন অন্ধকার জায়গাটায় আস্তে-আস্তে নামতে থাকে। নামবার মুখে ধরবার মতো নিচু ডাল ছিল না বলে তাকে প্রায় দশ হাত উঁচু থেকে লাফ দিয়ে নামতে হল। তবে নীচে পচা পাতার স্তূপ জমে গদির মতো হয়ে আছে, তাই বুরুনের ব্যথা লাগল না। ভুস করে পা দুটো ডেবে গেল শুধু, আর তলায় একটা কাঁটা বা কাচ যাই হোক তার পায়ে প্যাট করে বিঁধে গেল।

একটু ফাঁকায় এসে বুরুন মাটিতে বসে পায়ের তলাটা দেখছিল। তেমন কিছু নয়, একটা শামুকের ভাঙা খোল বিঁধেছে। তবে এসবে অভ্যাস আছে তার। শামুকের টুকরোটা বের করে একমুঠো দুব্বো তুলে ঘষে রসটা লাগিয়ে দিল। এ ওষুধ তার দাদুর শেখানো। দুব্বোর রসে অনেক অসুখ সারে, অনেক বিষ নষ্ট হয়।

দাদু তাকে অনেক কিছু শেখায়। মানুষের শরীরে রোজ এক রকমের বিষ তৈরি হচ্ছে, তাকে বলে টকসিন। এই বিষ জমে-জমে শরীরে নানা রোগের সূচনা করে। মাছ-মাংস খেলে টকসিনের পরিমাণ আরো বাড়ে। সেজন্য দাদু রোজ সকালে তাকে থানকুনি পাতার রস একটু আখের গুড় আর দুধ দিয়ে খাইয়ে অনেকখানি জল গিলিয়ে দেয়। তাতে টকসিন জমতে পারে না শরীরে। দাদু মাছ-মাংস খাওয়ার ঘোর বিরোধী। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে দাদুর প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক লেগে যায়। বাবা বলেন, প্রোটিনের জন্য মাছ-মাংস অতি প্রয়োজন। দাদু বলেন, পশুপাখির শরীরের কোষ আর মানুষের শরীরের কোষে অনেক গরমিল বাবা। ও খেলে খটামটি লাগবেই।

বুরুন পায়ে ঘাসের রস লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে অসংখ্য গাছে মেঘের মতো ঘনিয়ে আছে থোকা-থোকা বুনো কুল, বন-করমচা। কয়েকটা চালতা গাছ থেকে পাকা চালতার গন্ধ আসছে। চারদিকে ডানার শব্দ

তুলে পাখি উড়ছে, রঙিন পাখনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি। ভেজা মাটি, ঠাণ্ডা ছায়া আর নিস্তব্ধতায় জায়গাটা ঘোর হয়ে আছে।

এক থোকা বুনো কুল তুলে একটা কুল মুখে পুরেছে মাত্র, অমনি বুরুন দেখতে পেল, পুকুরের ওধারে লুঙ্গিপরা খালিগায়ে একটা লোক তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে।

অবাক হওয়ার কথা। পুকুরের চার ধারেই গহিন জঙ্গল। এ-পুকুরের ধারে-কাছেও কেউ আসতে পারে না। জল অব্যবহারে পচে সবুজ হয়ে আছে। কচুরিপানা হয়নি বটে, কিন্তু খুদে শ্যাওলায় জল ছেয়ে গেছে। ঘাট ভাঙা, পাড়ে জঙ্গল, চারদিকে কাঁটা আর বিছুটির ঘন বন। এ-জঙ্গলে কাঠ কুড়োতেও কেউ আসে না। তবে এ-লোকটা এল কোত্থেকে?

বুরুনও তাকিয়ে ছিল। তার মনটা খারাপ। নইলে সে লোকটাকে দেখে চমকে যেত কিংবা ভয় পেত। কিন্তু মন এতই খারাপ যে, বুরুন আর কোনো কিছুকে ভয় পাচ্ছে না। কিছুতেই তার কিছু যায় আসে না আর।

বুরুন দেখল, লোকটা হঠাৎ পুকুরের ধার দিয়ে নেমে জলের ওপর পা রাখল। তারপর অনায়াসে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে জোর কদমে চলে আসতে লাগল এদিকে। জলের ওপর কেউ হাঁটতে পারে, এ বুরুনের জানা ছিল না। দেখে সে অবাক। সায়েন্স তো এ-কথা মানে না। গ্র্যাভিটেশনের নিয়ম আছে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে। তবে?

যাই হোক, লোকটা কিন্তু হেঁটে চলে এল এপারে। পায়ের পাতাটাও ভেজেনি।

উঠে এসে লোকটা বড় বড় দাঁত বের করে হেসে বলল, "কি খোকা, ভয় পেয়েছ?"

বুরুন একটু অবাক হয়ে বলে, "ভয়? না, ভয় পাব কেন?

"পাওনি?" এবার লোকটাই অবাক।

"না, ভয় পাওয়ার কী আছে? আমি শুধু সায়েন্সের কথা ভাবছিলাম, মনে হল সায়েন্স এখনো অনেক কথা জানে না?"

"তা বটে।" বলে লোকটা একটু হেসে লোকে যেমন টুপি খোলে, ঠিক সেভাবে নিজের মাথাটা ঘাড় থেকে তুলে এনে হাতে নিয়ে একটু ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করল চাঁদির জায়গাটা, তারপর মুণ্ডুটা আবার যথাস্থানে লাগিয়ে বলল, "মাথায় খুব উকুন হয়েছে কিনা, তাই চুলকোচ্ছে।"

"ও।" বুরুন বলে।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে, "কী ব্যাপার তোমার বল তো! এবারও যে বড় ভয় পেলে না?"

বুরুন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আপনার মাথায় উকুন হয়েছে আর চুলকোচ্ছে বলে আমার ভয় পাওয়ার কী?"

লোকটা রেগে গিয়ে বলে, "তুমি ভাবছ আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি?"

"তা ভাবব কেন?"

লোকটা কটমট করে খানিক বুরুনকে দেখে নিয়ে বলে, "ভাবছ ম্যাজিক করছি?"

"হতে পারে।"

লোকটা হঠাৎ ডান হাতটা ওপর দিকে তুলল। বুরুন দেখল, হাতটা লম্বা হয়ে একটা চালতা গাছের মগডালে চলে গেছে। পরমুহূর্তে একটা পাকা চালতা পেড়ে এনে লোকটা সেটা বুরুনের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, "দেখলে?"

বুরুন বিরক্ত হয়ে বলে, "না দেখার কী? চোখের সামনেই তো পাড়লেন।"

লোকটা ধমকে উঠে বলে, "তবে ভয় পাচ্ছ না যে!"

"ভয় না পেলে কী করব?" এই বলে বুরুন থোকা থেকে কয়েকটা কুল ছিঁড়ে মুখে ফেলল।

লোকটা ভারি আঁশটে মুখ করে বলে, "লজ্জা করছে না কুল খেতে? চোখের সামনে জলজ্যান্ত আমাকে দেখতে পেয়েও নিশ্চিন্ত মনে কুল খাওয়া হচ্ছে? আরো দেখবে? অ্যাঁ!"

বলে লোকটা হঠাৎ ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাতটা খুলে নিয়ে চারদিকে তলোয়ারের মতো ঘোরাতে লাগল; তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত খুলে নিল। দুটো পা দু' হাতে খুলে নিয়ে দেখাল। তারপর একবার অদৃশ্য হয়ে ফের হাজির হল। তেরো-চোদ্দ ফুট লম্বা হয়ে গেল, আবার হোমিওপ্যাথির শিশির মতো ছোট্ট হয়ে গেল। এসব করে হাঁফাতে-হাঁফাতে আবার আগের মতো হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখলে?"

"হুঁ!"

"হুঁ মানে? এ-সব দেখার পরও মূর্ছা যাচ্ছ না যে! দৌড়ে পালাচ্ছ না যে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুল খেয়ে যাচ্ছ যে বড়! আমি কে জানো?"

"কে?"

"আমি গোসাঁই ডাকাতের বড় স্যাঙাৎ নিধিরাম। দুশো বছর ধরে এখানে আছি, বুঝলে? দুশো বছর।"

"বুঝলাম।"

"কী বুঝলে?"

বুরুন বিরক্ত হয়ে বলে, "এসব তো সোজা কথা। বোঝাবুঝির কী আছে! আপনি দুশো বছর ধরে এখানে আছেন।"

লোকটা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "তুমি বাপু তলিয়ে বুঝছ না।

দুশো বছর কি কোনো মানুষ বেঁচে থাকে, বলো!"

"তা থাকে না।"

"তবে আমি আছি কী করে?"

"থাকলে আমি কী করব?"

লোকটা রেগে উঠে বলে, "তবু তুমি তলিয়ে বুঝছ না কিন্তু। আমি আসলে বেঁচে নেই।"

বুরুন আর একটা কুল মুখে দিয়ে বলে, "তাতে আমার কী?"

"ওঃ, খুবই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছ যে! ভূতকে ভয় পাও না, কেমনতরো বেয়াদব ছেলে হে তুমি!"

বুরুন বলল, "ভয় লাগছে না যে।"

এই কথা শুনে লোকটার চোয়াড়ে মুখটা ভারি করুণ হয়ে গেল। অসহায়ভাবে ছলছলে চোখে চেয়ে রইল বুরুনের দিকে। ফোঁত করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "একটুও ভয় লাগছে না?"

"না।"

নিধিরাম হাতের পিঠে চোখের জল মুছল বোধহয়। মনের দুঃখে তার নাকের ডগা কাঁপছিল। চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, "তুমি আমাকে বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি। এখন নিজেদের সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন করে বলো তো! গোঁসাই সর্দার শুনলে আমার গর্দান যাবে।"

বুরুন একটা ফুঃ শব্দ করে বলে, "আপনার আবার গর্দান যাওয়ার ভয়! মুণ্ডুটা তো একটু আগে ফুটবলের মতো হাতে ধরে রেখেছিলেন।"

লোকটা দুঃখের সঙ্গে বলে, "আমাদের নিয়ম অন্যরকম। কেউ যদি কোনো দোষ করে, তাহলে গোসাঁইবাবা তার মুণ্ডু কেড়ে রেখে দেন। তোমরা বললা 'লজ্জায় মাথা কাটা গেল'; সে হল কথার কথা। আসলে তো আর মাথা কাটা যায় না। কিন্তু আমাদের সত্যি-সত্যিই মাথা কাটা যায়। আমাদের সমাজে সে বড় লজ্জার ব্যাপার। তুমি কি একটু চেষ্টা করে দেখবে নাকি খোকা, যদি একটু ভয়-টয় করতে পারো!"

বুরুন বলল, "না, সে হওয়ার নয়! আজ আমার মনটা ভাল নেই। মেজাজ খারাপ থাকলে আমার ভয়ডর থাকে না।"

লোকটা খুব আশান্বিত হয়ে বলে, "কেন, কেন, তোমার মন খারাপ কেন বলো তো! আমি তোমার মন-মেজাজ ভাল করবার জন্যে যা করতে বলবে তা-ই করব। কিন্তু কথা দিতে হবে যে, আমাকে একটু ভয় করবে।"

বুরুন নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "সে হওয়ার নয়। আমি অঙ্কে তেরো পেয়েছি।"

লোকটা এক গাল হেসে বলে, "এই কথা। তা আমি তোমাকে সব অঙ্ক শিখিয়ে দেব। নয়তো পরীক্ষার সময় অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তোমার অঙ্ক কষে দিয়ে আসব। তাহলে এবার একটু ভয় খাও, অ্যাঁ! লক্ষ্মী সোনা ছেলে!"

বুরুন আবার গুটি চারেক কুল মুখে দিয়ে বলে, "ভূতের কাছে কেউ অঙ্ক শেখে? আমি আঁক শিখব করালী স্যারের কাছে।"

লোকটা খুব ভাবিত হয়ে বলে, "তাই তো! বড় বিপদ দেখছি। তোমার মন-মেজাজ ভাল করতে না-পারলে তো তুমি কিছুতেই ভয় পাবে না তাহলে। শোনো খোকা, আমি কিন্তু আরো কাণ্ড জানি। এক্ষুনি এমন মন্ত্র বলব যে শোঁ শোঁ করে ঝড় এসে যাবে, বিড়বিড়িয়ে শিলাবৃষ্টি পড়বে, কিংবা চাও তো দিনের আলোয় ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার নামিয়ে আনতে পারি। সেই অন্ধকারে কঙ্কাল আর কবন্ধরা চারিদিকে ধেই-ধেই করে নাচবে।"

বুরুন অবহেলাভরে বলে, "যা খুশি করুন না, বারণ করছে কে?"

"তবু ভয় পাবে না?"

"না।"

লোকটা মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে চোখের জল মুছতে-মুছতে আপন মনে বলতে থাকে, "গোঁসাই বাবা আমাকে নীচের পোস্টে নামিয়ে দেবে, মাথা কেড়ে রেখে দেবে, কেউ আমাকে আর ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে না।"

চারদিকে গাছ-গাছালি থেকে অশরীরীরা এতক্ষণ চুপচাপ কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। এবার সবাই সুর করে বলে উঠল, "নিধিরাম দুয়ো! নিধিরাম দুয়ো! নিধিরাম দুয়ো!"

বুরুন ভারি বিরক্ত বোধ করে। এ জায়গাটাকে সে নিরিবিলি আর নির্জন বলে ভেবেছিল। এখন দেখল মোটেই তা নয়! চারদিকে খুব হতাশভাবে তাকিয়ে সে আবার একটা শিশুগাছে উঠে ডাল বেয়ে-বেয়ে ফিরে যেতে লাগল।

মেজাজটা আজ তার সত্যিই খারাপ।

সন্ধের পর বুরুনের দাদু রাম কবিরাজ তাঁর দোকান-ঘরে বসে আছেন। হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে এবার। সূর্য ডোবার পর আর রাস্তায় বড় একটা লোক-চলাচল নেই। বাজারও অর্ধেক বন্ধ। খদ্দেরের আনাগোনা খুবই কম। শুধু কবিরাজমশাইয়ের দোকানে নিত্যকার আড্ডাধারীরা এসেছে।

আড্ডাধারীরা সবাই বুড়ো-সুড়ো মানুষ। গায়ে আলোয়ান, মাথায় বাঁদুরে টুপি, গলায় কমফর্টার, পায়ে মোজা চাপিয়ে সব ঝুব্বুস হয়ে বসে আছেন। টেবিলের ওপর একটা লম্ফ জ্বলছে।

রাম কবিরাজ বললেন, "আমার নাতি বুরুন এবার অঙ্কে তেরো পেয়েছে, জানো তো সবাই!"

সবাই একবাক্যে বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব জানি।"

রামবাবু দাঁত খিচিয়ে বলে উঠলেন, "তা আর জানবে না! ছেলের বাপ যে সারা শহরে ঢোল সহরত করে সে-কথা লোককে জানিয়েছে। কিন্তু আমি বলি বাপু, অঙ্কে তেরো পেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়! যারা বিদ্বান বুদ্ধিমান, তাদের অবস্থা তো দেখছি। এই ধরো না কেন, আমার ছেলে ভেলু তো সোনার মেডেল পেয়ে পাশ করা ডাক্তার, নামডাকও খুব। কিন্তু এখনো রুগির নাড়ী ধরে বলে দিতে পারবে না, রুগির পেটের ব্যামো না বুকের ব্যথা, রুগি রাগী না বেকুব। সেসব বোঝা কি সোজা কথা! তবু গলায় নল ঝুলিয়ে হাতে ছুঁচ বাগিয়ে মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে। আমি বলে দিচ্ছি, নাতিকে কবিরাজি শেখাব। অঙ্কে তেরো পেয়েছে তোত কুছ পরোয়া নেই, অবিদ্যা শেখার চেয়ে মুখ্যু থাকা ভাল।"

সবাই সায় দিয়ে ওঠেন, "তা বটে! তা বটে!"

সায় না দিয়ে উপায়ও নেই। রাম কবিরাজকে সবাই ভয় পায়। ভারি সৎ, তেজী আর আদর্শবাদী লোক।

রাম কবিরাজ নাতির পক্ষ হয়ে আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এই সময়ে রিটায়ার্ড সাব জজ ধীরেন চাটুজ্যে হাতে ছাতা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ছাতা দেখে সবাই অবাক।

মহিমবাবু বলে উঠলেন, "ধীরেন যে আজ বড় ছত্রপতি সেজে এসেছ। বাইরে বৃষ্টি বাদলা হচ্ছে নাকি?"

ধীরেনবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, "আরে না। ছাতাটা একটা অস্ত্রবল।"

"অস্ত্রবল? কিসের অস্ত্রবল হে? অস্ত্রের কথা ওঠে কেন?"

"ওঠে, ওঠে।" বলে ধীরেনবাবু একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে গলাবন্ধ কোটের ওপরের কয়েকটা বোম খুলতে-খুলতে বললেন, "দিনকাল ভাল নয় হে। এই গঞ্জে যে বাঘ বেরিয়েছে, সে-খবর রাখো?"

"বাঘ!"

“বাঘ!”

“বাঘ!”

সকলের একবাক্যে প্রশ্ন।

ধীরেনবাবু বললেন, “গল্প শুনেছিলাম, এক সাহেব ছাতা হাতে জঙ্গলের ধারে বেড়াতে গিয়ে বাঘের মুখখামুখি পড়ে যায়। বুদ্ধি করে তখন সাহেবটা বাঘের মুখের সামনে পটাং করে ছাতাটা খুলে ধরতেই বাঘ ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তাই ছাতাটা নিয়ে বেরিয়েছি আজ।”

রাম কবিরাজ ধমক দিয়ে বললেন, “ধানাই-পানাই ছেড়ে আসল কথাটা বলবে তো! বলি বাঘ কোথায়?”

“আর বলো কেন! বিকেলের দিকে একটু হায়পাথার চা-বাগানের দিকে নিরালা মাঠের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম আজ। সঙ্গে নাতি। তা হঠাৎ নাতি বায়না ধরল, কুকুরের বাচ্চা নেবে। চেয়ে দেখি মাঠের মধ্যে চার-পাঁচটা কুকুরছানা খেলা করছে। নাতির বায়নায় অবশেষে কুকুরছানা ধরতে মাঠে নামতে হল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি, ও বাবা! কুকুরছানা কোথায়! চার-পাঁচটা বাঘের বাচ্চা এ ওর গায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দিব্যি খেলছে!”

“ঠিক দেখেছ যে সেগুলো বাঘের বাচ্চা?”

ধীরেনবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, “একেবারে রায়বাঘা। চিতা বা গেছো বাঘ নয়, গায়ে-ডোরা-কাটা দক্ষিণ রায়। সেই দেখে তো আমি নাতিকে পাঁজাকোলে নিয়ে দে ছুট, দে ছুট। বাঘের বাচ্চা যখন দেখা গেছে, তখন মা-বাঘ বা বাবা-বাঘও কাছেপিঠেই আছে। সবাই খুব সাবধানে থেকো হে!”

হেমবাবু উঠে জুতো পরতে পরতে বললেন, “আমি বরং রওনা দিই। দিগিন আমাকে একটু এগিয়ে গিয়ে আসুক।”

বাকি সবাইও উশখুশ করতে থাকেন। উপেনবাবু আপন মনে "রাম রাম" করছিলেন শুনে শশধরবাবু তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "ও তো ভূতের মন্ত্র! বাঘ কি আর রাম-নাম শুনে পালায়?"

"তবে?" উপেনবাবু জিগ্যেস করেন।

রামবাবুর ভয়ডর নেই। নিশ্চিন্ত মনে বললেন, "তা বাঘের নামে ভয় পেলে চলবে কেন। উত্তরবাংলার এসব অঞ্চলে তো বাঘ বেরোবেই। গত বছরও বেরিয়েছিল। তবে শহরের মাঝখানে আসে না।"

সবাই বলে ওঠে, "তা বটে! তবে কিনা—"

আড্ডাধারীরা আজ আর বেশিক্ষণ বসলেন না। চক্ষুলজ্জায় খানিকক্ষণ বসে থেকে, সব দল বেঁধে উঠে পড়লেন। গেলেন না শুধু মন্মথবাবু।

রামবাবুর ভয়ডর নেই। সবাই চলে যাওয়ার পরেও নিশ্চিন্ত মনে বসে রইলেন। রুগি-টুগি বড়-একটা কবিরাজের কাছে আসতে চায় না। তারা মরতে-মরতে গিয়ে ভিড় করে তাঁর ছেলে ভেলুর চেম্বারে। তবু রাম কবিরাজ ধৈর্য ধরে বসে থাকেন। সত্তরের ওপর বয়স হল, তবু এখনো তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয়ংকর আশাবাদী।

মন্মথবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, "আর যাওয়া! বাঘের ভয় করি না হে! এখন তার চেয়ে অনেক বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে।"

"কীরকম?"

"হাবু গুণ্ডার কথা তোমার মনে আছে?"

কবিরাজমশাই বললেন, "খুব আছে, খুব আছে। হাবুর মামলায় তুমি হাকিম ছিলে, আমি সাক্ষী দিয়েছিলাম। বারো-চোদ্দ বছর আগেরকার কথা, মনে থাকবে না কেন?"

মন্মথবাবু আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমি হাবুকে যাবজ্জীবন কয়েদের রায় দিয়েছিলাম।"

"তাও জানি। খুব ভাল কাজ করেছিলে। হাবুর মতো বদমাশ দুটো হয় না। কত যে খুন করেছে এ মহকুমায়, তার ঠিক নেই।"

মন্মথবাবু চিন্তিত সুরে বলেন, "সে ঠিক। কিন্তু জেল হওয়ার পর নাকি হাবু রোজ সকালে গীতা পাঠ করত, সন্ধ্যা-আহ্নিক করত, একাদশী-পূর্ণিমায় উপোস দিত। জেলখানায় তার চরিত্রের খুব সুনাম হয়, সবাই তাকে সাধুবাবা বলে ডাকত। এমন কি, পুলিস জেলার পর্যন্ত সবাই তাকে সম্মানও করতে শুরু করে।"

"সেও কানাঘুষোয় শুনেছি।"

মন্মথবাবু আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল।"

"তার মানে?"

"এই দেখ না!"

বলে মন্মথবাবু তাঁর চাদরের তলায় হাত দিয়ে পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে একটা খাম বের করে কবিরাজ মশাইয়ের হাতে দিলেন।

রামবাবু ভ্রূ কুঁচকে চিঠিটা পড়তে লাগলেন। "শ্রীশ্রীকালীমাতা সহায়। মাননীয় মহাশয়, পত্রে আমার নমস্কার জানিবেন। বিধিমতো আপনার বরাবর নিবেদিন করিতেছি যে, আমাদের পরম মাননীয় হাবু ওস্তাদ আগামী দোলের আগের দিন খালাস পাইতেছেন। হাবু ওস্তাদের প্রতি আপনি যে নিষ্ঠুর সাজার বিধান

দিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভুলি নাই। শ্রীশ্রীকালীমাতার নামে শপথ করিতেছি, হাবু ওস্তাদ খালাস হইবার সাত দিনের মধ্যে আমরা চরম প্রতিশোধ লইব। প্রস্তুত থাকিবেন। ইতি হাবু ওস্তাদের ভক্তবৃন্দ।"

চিঠি পড়া শেষ করে কবিরাজমশাই বলেন, "কবে পেলে চিঠিটা?"

"আজকের ডাকেই এল।"

রাম কবিরাজ একটু নিশ্চিন্তের হাসি হেসে বললেন, "ভয় পেয়েছ নাকি?"

মন্মথবাবু উদাস স্বরে বলেন, "ভয়ের আর কী! বুড়ো হয়েছি, এখন মরার ভয় বড় একটা নেই। তবে কিনা এ-লোকগুলো তো ভাল নয়। এদের হাতে যদি অপঘাতে প্রাণ দিতে হয়, তবে আর পরকালে গতি হবে না।"

রাম কবিরাজ হাঃ হাঃ করে ভরাট গলায় হেসে বললেন, "গতি হবে না তো হবে না, দুজনে অপঘাতে মরে নাহয় গিয়ে গোঁসাইবাগানে ভূত হয়ে থাকব আর দেদার আড্ডা মারব। গোসাঁইবাগান জায়গাও ভাল, ভারি নিরিবিলি, লোক চলাচল নেই, সেখানে গাছ-গাছড়াও প্রচুর। ভূতদের রোগ-ভোগ সারাতে গাছ-গাছড়া তুলে ওষুধ বানাব মনের আনন্দে। প্র্যাকটিস ভালই জমবে। তুমিও গিয়ে হাকিমি করতে পারবে।"

যেই রাম কবিরাজ এ কথা বলেছেন, অমনি দোকানঘরের মধ্যে যেন ছোট্ট একটা ঘূর্ণিঝড় খেলে গেল। শিশি-বোতলগুলো নড়ে উঠল খটাখট করে।

রাম কবিরাজ একটু অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। মন্মথবাবুও সচকিত হয়ে বললেন, "ঝড় ছাড়ল নাকি?"

রামবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আরে না! শীতকালে ঝড় আসবে কোত্থেকে? বোধ হয় উত্তুরে বাতাসের একটা ঝাপটা এল।"

মন্মথবাবু আরো খানিকক্ষণ বসে থেকে বলেন, "রাত হল হে! এবার উঠি।"

"বোস। তামাক সাজি।"

মন্মথবাবু বসেন। রাম কবিরাজ উঠে দোকানঘরের পিছনে ছোট্ট কুঠরিতে তামাক সাজতে বসেন। কলকে সাজিয়ে ফুঁ দিতে দিতে সামনের দোকানঘরে এসে গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে নলটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "নাও হে।"

তারপর অবাক হয়ে দেখেন গড়গড়ার নল যার দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন, সেই লোকটাই নেই!

"গেল কোথায় মন্মথ?" আপনমনে এই কথা বলে রাম কবিরাজ চেয়ারে বসে অন্যমনে তামাক খেতে লাগলেন। চারদিকটা খুব নিঃঝুম হয়ে এসেছে। বাজারের দোকানপাট সবই প্রায় ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। ছোট গঞ্জ-শহরে এমনিতেই লোক কম, তার ওপর বেজায় শীতের রাত্রি। খামোখা লোকে ঘরের বাইরে থাকতে চায় না।

রাম কবিরাজের অবশ্য শীত, বাঘ, ভূত—কাউকেই ভয় নেই। বুড়ো হলেও ভারি ডাকাবুকো লোক। বসে বসে রামবাবু হাবু গুণ্ডার কথা ভাবছিলেন।

রাম কবিরাজ হাবুর সবকিছুই জানেন। এই গঞ্জে তাকে শিশুবেলা থেকে বড় হতে দেখেছেন। দাসু রায়ের বড় আদরের একমাত্র ছেলে ছিল হাবু। বাবা-মার অত্যধিক আদর আর প্রশ্রয় পেয়ে অল্প বয়স থেকে বিগড়ে যায়। ইস্কুল পালিয়ে গোসাঁইবাগানে গিয়ে বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি ফুঁকত। তাই দেখে একদিন রামবাবু গিয়ে দাসু রায়কে বলেছিলেন, "ছেলেটার দিকে নজর দাও হে দাসু! বিড়ি ফুঁকতে শিখেছে যে!" দাসু কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ। খেঁকিয়ে উঠে বলল, "যাও, যাও, নিজের কাজ করো গে যাও। আমার ছেলে তেমন নয় মোটেই। লোকে হিংসে করে যা-তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।"

একমাত্র ছেলে বলে হাবুর কোনো অভাব রাখত না দাসু। মাসে মাসে ওইটুকু ছেলেকে দশ-পনেরো টাকা করে হাতখরচ পর্যন্ত দিত। সেই টাকা পেয়ে হাবু আরো বিগড়োতে থাকে। ঘুড়ি, লাটাই, লাট্টু, লজেন্স দেদার কিনেও টাকা ফুরোত না। প্রায়ই বখাটে বন্ধুদের সঙ্গে ফিষ্টি করত, যাত্রা-সিনেমা দেখে বেড়াত। খুব ফুর্তিবাজ হয়ে গেল অল্প বয়সেই, ক্লাসের পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে বাসায় ফিরে কাঁদতে বসত। সেটা অবশ্য মায়াকান্না। ছেলের চোখে জল দেখে তার বাবা-মা এসে হাবুকে পারলে কোলে তুলে সান্ত্বনা দেয়। দাসু বলে বেড়াত, "আমার ছেলের মতো বুদ্ধিমান ছেলে দুটো নেই। কিন্তু পড়তে বসলেই তার চোখ ব্যথা করে। ভাবছি চোখের ডাক্তার দেখাব। সামনের বছর হাবু ক্লাসে ফার্স্ট হবে।"

দাসু যে খুব বাড়িয়ে বলত তা নয়, বাস্তবিক হাবু খুবই বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। বখাটে হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে স্কুলে ফার্স্টও হয়েছে।

যাই হোক, হাবুর যখন মোটে চোদ্দ বছর বয়স, তখন সে বাপের সিন্দুক থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা আর মায়ের গয়না চুরি করে উধাও হয়ে যায়। সেই শোকে দাসু আর বেশি দিন বাঁচল না, হাবুর মাও বছর দুই বাদে চোখে ওল্টায়। তার বেশ কয়েক বছর পর একদল ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হাবু এসে গোঁসাইবাগানে থানা গাড়ল। তার তখন পেল্লায় চেহারা হয়েছে, চোখদুটো সব সময় রক্তবর্ণ, কাউকে গ্রাহ্য করে না। একে মারে, তাকে ধরে, তারটা কেড়ে নেয়। তারপর গঞ্জে এবং আশপাশের এলাকায় খুব চুরি-ডাকাতি আর খুন-খারাবি শুরু হয়ে গেল। সেই এক দুঃস্বপ্ন। কোনো লোক নিশ্চিন্তে রাস্তায় বেরোতে পারে না। সন্ধের পর রাস্তাঘাট নিঃঝুম হয়ে যায়। বাড়িতে থেকেও লোকের প্রাণ ধুকপুক করত।

হাবু নাকি মেলা মন্ত্রতন্ত্র শিখে এসেছে। গোঁসাইবাগানের কুঠিবাড়িতে সে নানারকম সাধনা করে বলে গুজব রটে গেল। অনেকের মুখে রাম কবিরাজ শুনেছেন যে, সন্ধেবেলা হাবুকে নাকি কখনো কখনো একটা প্রকাণ্ড বাঘের পিঠে চড়ে বেড়াতে দেখা গেছে। একজন বলল, সে স্বচক্ষে হাবুকে উড়ে বেড়াতে দেখেছে।

তখন গঞ্জের দারোগা ছিলেন নিশিকান্ত। নিশি দারোগা এক সময়ে খুব দাপটের লোক ছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর বয়স হয়েছে, রিটায়ার করতে যাচ্ছেন, তাই তিনি আর বেশি ঝুট ঝামেলায় যেতেন না। হাবুর অত্যাচারে

অতিষ্ঠ হয়েও লোকে ভয়ে থানায় গিয়ে নালিশ করত না। সে সময়ে রাম কবিরাজই উদ্যোগী হয়ে গিয়ে নিশি দারোগাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজী করিয়েছিলেন।

দিন দুই-তিন পরে নিশি দারোগা একদিন রামবাবুর দোকানে এসে হ্যাট খুলে হাঁপ ছেড়ে বললেন, "ওঃ মশাই, কী লোককেই ধরতে পাঠিয়েছিলেন! নাজেহাল করে ছেড়েছে।"

"কী রকম?" বলে রাম কবিরাজ নড়ে বসলেন।

"আর বলবেন না। গোঁসাইবাগানে গিয়ে পুরো বাড়িটা ঘেরাও করে রেইড করেছিলাম। তখন হাবু আর তার দলবল বাড়ির ভিতরেই ছিল। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে দেখলাম সব ভোঁ-ভাঁ, কেউ কোথাও নেই।"

"সে কি?"

"তবে আর বলছি কী? চোখের সামনে অতগুলো লোক একেবারে গায়েব হয়ে গেল মশাই! বাইরে থেকে জানালা দিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি, হাবুকে ঘিরে দশ-বারোটা লোক বসে গাঁজা টানছে। ভাল করে বাড়িটা ঘিরে বাঁশি ফুঁকে রিভলবার-বন্দুক বাগিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'হাবু, সারেন্ডার কর শিগগির!' কিন্তু কাকে বলা? ঘরে হাবু আর তার স্যাঙাতদের চিহ্নও নেই। গুপ্ত কুঠুরি বা সুড়ঙ্গ আছে কিনা অনেক খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। একেবারে তাজ্জব ব্যাপার।"

শুনে রাম কবিরাজ ঘন-ঘন তামাকের নলে টান দিয়েছিলেন সেদিন। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল।

সেই থেকে হাবু গুণ্ডার নামে সম্ভব-অসম্ভব আরো সব গুজব রটতে লাগল। হাবু নাকি ভূত পোষে, মন্ত্রের জোরে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, যে-কোনো মানুষকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে হাওয়া করে দিতে পারে। হাবুর ভয়ে তখন সবাই থরহরি কম্প।

রাম কবিরাজ মন্ত্র-তন্ত্র বা ভূতপ্রেত মানেন। কিন্তু এসব বুজরুকিতে তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি জানেন, খারাপ লোক যতই মন্ত্রতন্ত্র জানুক আর যতই ক্ষমতাবান হোক, শুভবোধ এবং মঙ্গলের দ্বারা তাদের পতন ঘটবেই।

সেই থেকে রাম কবিরাজ নানা মতলব ভেঁজেছেন। হাবু অবশ্য রাম কবিরাজের এসব মতলব টের পায়নি। পেলে এসে হামলা করত।

নিশি দারোগা রিটায়ার করে চলে গেলে সে জায়গায় এক অল্পবয়সী এবং খুব তেজী দারোগা এল। তার নাম অয়স্কান্ত। মহা কাজের মানুষ।

সে গঞ্জে পা দিয়েই হাবু গুণ্ডার কথা শুনেছে। হাবু তখন সদ্য হরিহরপুরের জমিদারবাড়ি লুট; একটা ব্যাংক ডাকাতি আর দুটো বড় ধরনের চরি করেছে। তাছাড়া খুন-জখম তো ছিলই। কিন্তু কেউ তার নামে নালিশ করতে যায় না ভয়ে। তার ওপর হাবুর বদনাম হওয়ার বদলে তার বেশ সুনামই হচ্ছিল। তার অলৌকিক ক্ষমতা, তার সাহস আর তার নামে প্রচলিত গালগল্প শুনে অনেকেই হাবুকে মনে-মনে পুজো করত। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেরা তখন নিজেদের মধ্যে 'হাবু-হাবু' খেলে। একটু বড় বয়সের ছেলে-ছোকরারা অনেকেই তখন হাবুর দলে ভিড়বার জন্য গোসাঁইবাগানের কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করে।

রাম কবিরাজ এবং তাঁর মতো আর যাঁরা সৎ আর স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন, তাঁরা দেখলেন, সমূহ সর্বনাশ! এরপর হাবুর খ্যাতি এত বেড়ে যাবে যে, পুলিসও তাকে ধরতে সাহস করবে না। অধর্মেরই জয় হয়ে যাবে। হাবুরও অহংকার আর বেয়াদপি খুব বেড়ে গেছে। সে রাজা-বাদশার মতো চলাফেরা করে। রাস্তার লোক

তাকে দেখলে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, বাজার-হাটে লোকে তাকে নমস্কার করে, একটু কথা বলতে পারলে বর্তে যায়।

অয়স্কান্তও কিন্তু খুব অহংকারী লোক। সে জানত, মফস্বল শহরে দারোগার ওপর আর কেউ নেই। সবাই বরাবর দারোগাকেই খাতির করে এসেছে। তাই হাবুর এত খাতির অয়স্কান্ত সহ্য করবে কেন? ব্যাপারটা তার সম্মানে খুব ঘা দিল।

তা, অয়স্কান্ত যখন হাবুকে জব্দ করার নানারকম ফন্দিফিকির আঁটছে, তখন একদিন এক অবাক কাণ্ড।

অয়স্কান্ত সন্ধেবেলায় তার কোয়াটারের বারান্দায় একা বসে বসে পূর্ণিমা দেখছে। এমন সময় রাস্তা থেকে ডোরাকাটা একটা প্রকাণ্ড বাঘ হেলতে-দুলতে ফটক পেরিয়ে সোজা উঠে এল। বাঘের পিঠে হাবু।

অয়স্কান্ত যদিও সাহসী লোক, কিন্তু সেই দৃশ্য দেখে তারও প্রাণ উড়ু-উড়ু।

হাবুর বাঘ দুর্গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে এসে নোংরা মুখে অয়স্কান্তর গা শুঁকল, গাল চেটে দিল। গর্-গর্ করে আদর জানাল।

হাবু অয়স্কান্তকে বলল, "দ্যাখো দারোগাবাবু, আমার সঙ্গে টক্কর দিতে চাইলে কিন্তু জান কবুল করে কাজে নামতে হবে। এ তো কেবল বাঘ দেখছ, আমার হাতিকে তো এখনো দেখনি! তাছাড়া আর যারা আছে তারা আরো ভয়ের সামগ্রী। কাঁচাখেগো অপদেবতা সব। চাকরি করতে এসেছ, চোখ বুজে চাকরি করে যাবে। মাস-মাইনে পেয়ে খাবে-দাবে ফুর্তি করবে, কেউ কিছু বলবে না। যদি কাজ দেখাতে চাও তবে কিন্তু বিপদের জন্য তৈরি থেকো।"

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট বাঘের গায়ের ডোরা দেখা যাচ্ছে। বিটকেল গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শ্বাস গায়ে পড়ছে। অয়স্কান্তর নিজের চোখে দেখা, হাত দিয়ে ছোঁয়া ব্যাপার। কোনো ভুল নেই।

অয়স্কান্ত কথা বলতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। নড়তে গিয়ে দেখে হাত পা আড়ষ্ট।

হাবু মুচকি হেসে বাঘটাকে সরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি হলাম এ-তল্লাটের রাজা বলো রাজা, সর্দার বলো সর্দার, ভগবান বলো ভগবান। সবাই আমাকে একবাক্যে মানে। এরপর থেকে তুমিও মেনো।"

সেই রাতেই অয়স্কান্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো এসে রাম কবিরাজের কাছে হাজির। বলে, "কবিরাজমশাই, হাবু মানুষ নয়!"

সব শুনে রাম কবিরাজ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেন। তারপর একটা খুব বলকারক পাঁচন অয়স্কান্তকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি আগে একটু ধাতস্থ হও, তারপর অন্য কথা হবে!"

রাম কবিরাজ এমন সব আশ্চর্য পাঁচন তৈরি করতে পারেন, যা খেলে মানুষ-কে-মানুষ পর্যন্ত পাল্টে যায়। রাম কবিরাজের সেই পাঁচন খেয়ে অয়স্কান্তর ভোম্বল-ভোম্বল ভাবটা ঘন্টাখানেক পর কেটে গেল। তবু সে বলতে লাগল, "না কবিরাজমশাই, মিরাক্‌লের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক নয়। মানুষ যত পাজি বদমাশ হোক, তাকে ঢিট করতে ভয় পাই না। কিন্তু হাবু তো ঠিক মানুষ নয়।"

তা, তা-ই হল। অয়স্কান্ত বদলি নিয়ে চলে গেল। এল আর-এক তেজী দারোগা গদাধর।

গদাধর খুবই মজবুত চেহারার মানুষ। এক সময়ে নামকরা কুস্তিগীর ছিল। বয়সও বেশি নয়। তার আবার একটা বিশাল জার্মান শেফার্ড কুকুর ছিল।

গদাধর আসবার পরই গঞ্জের লোক বলাবলি করতে লাগল, হাবুর-বাঘের জন্য নতুন পাঁঠার আমদানি হয়েছে! ছেলেরা ছড়া কাটতে লাগল, "গদাই দারোগা, হয়ে যাবে রোগা।"

গদাধরের কানে সবই গেল। হাবুর গুণকীর্তির কথাও সে এখানে আসবার আগেই শুনে এসেছে। গঞ্জে পা দিয়ে সে খুব বেশি কেরানি দেখানোর চেষ্টা করল না।

রাম কবিরাজের কাছে একদিন গভীর রাতে চুপি-চুপি এসে গদাই দারোগা বলল, "আমি আপনার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানতে চাই।"

রামবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "জেনে লাভ কী? কেউ কিছু করতে পারবে না। অনেকেই গঞ্জের বাস উঠিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে।"

তখন গঞ্জে আবার নতুন নিয়ম চালু করেছে হাবু। তার বাঘের খোরাকি বাবদ প্রতিদিন একজন করে গৃহস্থকে পাঁঠা, ছাগল বা কুকুর দিতে হয়। বাঘেরা নাকি কুকুরের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। সেজন্য গঞ্জে যত রাস্তার কুকুর ছিল সব লোপাট হয়ে গেছে প্রায়! ওদিকে গোঁসাইবাগানে মিস্তিরি লাগিয়ে হাবুর জন্য প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ হাবুর তখন ভরভরন্ত অবস্থা।

গদাই দারোগা বলে, "আমি যে খুব কাজের লোক, তা বলছি না। তবে সাবধানী লোক। সব শুনেটুনে তারপর যদি কিছু করা যায় তা দেখব। আমাকে স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠানো হয়েছে এখানে।"

রাম কবিরাজ খুব আশ্বস্ত হলেন না। তবু সবই খোলসা করে বললেন। আর সাবধান করে দিলেন এই বলে, "দেখুন, এখানকার লোকজন কিন্তু সবাই হাবুর পক্ষে, কাজেই বিপদে পড়লে তারা আপনাকে সাহায্য করবে না।"

গদাই হেসে বলল, "বেশি লোকের সাহায্য চাই না। আপনার মতো দু'-একটা পাকা মাথার লোক সাহায্য করলেই আমার হবে।"

রাম কবিরাজ বুঝলেন, গদাই দারোগা কুস্তিগীর ছিল বটে, কিন্তু তাতে বুদ্ধিটা নষ্ট হয়নি।

যাই হোক, দু'-একদিনের মধ্যে হাবু গদাই দারোগার পিছনে লাগল। একদিন সকালে দেখা গেল, গদাইয়ের অতি আদরের কুকুরটা লোপাট। খোঁজ খোঁজ! অবশেষে কুকুরটার মখমলের মতো গায়ের চামড়াটা পাওয়া গেল গোঁসাইবাগানের কাছে একটা জামগাছের তলায়।

গদাই দিন-তিনেক ভাল করে খেল না, ঘুমোল না।

রাম কবিরাজ তাঁকেও একটা ভাল পাঁচন তৈরি করে পাঠিয়ে দিলেন।

গদাই দারোগার কুকুরটাকে মেরে হাবু চালে ভুল করেছিল। কুকুরটা ছিল গদাইয়ের প্রাণ। সেই কুকুরের মৃত্যুতে গদাই দারোগা হয়ে উঠল 'গদাই বিভীষিকা'।

অবশ্য কয়েকজন জানে, গদাই দারোগার সেই মারমুখো মেজাজের পিছনে কবিরাজমশাইয়ের আশ্চর্য পাঁচনের কাজও আছে। রাম কবিরাজ এমন এক দুর্লভ গাছ-গাছড়ার পাঁচন তৈরি করে গদাধরকে খাইয়েছিলেন যে, তাতে মানুষের শরীরে যেমন দুনো বল হয়, তেমনি তার মেজাজও হয়ে ওঠে টংকার। আবার গায়ের

জোর আর বদমেজাজ হলেই হয় না, ঠাণ্ডা মাথার কূটবুদ্ধিও খেলাতে হয়, নইলে হাবুর মতো ধুরন্ধরকে জব্দ করা সোজা নয়। তাই কবিরাজ মশাই আবার পাঁচনে এমন জিনিসও দিয়েছিলেন যে তাতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, বুদ্ধির হাওয়া-বাতাস খেলে।

কাণ্ডটা কী হয়েছিল কেউ ভাল জানে না, তবে হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, হাবুর পোষা বাঘটাকে পাওয়া যাচ্ছে না, চারদিকে খোঁজ খোঁজ। অবশেষে একদিন দেখা গেল থানার হাতায় গদাই দারোগার কোয়ার্টারের বাগানের বেড়ায় বাঘের চামড়াটা রোদে শুকোচ্ছে।

এই ঘটনায় গঞ্জে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই ভেবে নিল, হাবুর বাঘ যখন মরেছে, তখন গদাইয়ের আর রক্ষে নেই। তার মুণ্ডু কেটে নিয়ে শিগগিরই হাবু গেণ্ডুয়া খেলবে।

বাঘ গুম হওয়ার সময়ে হাবু গঞ্জে ছিল না। বাইরে কোথাও ডাকাতি বা লুটপাট করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে সব শুনে দু'দিন গুম হয়ে রইল।

তারপর একদিন সোজা গিয়ে গদাইয়ের বাসায় হানা দিয়ে গদাইকে বলল, "তুমি মরলে কে কে কাঁদবে বলো তো?"

গদাই বিনীতভাবে বলে, "কেউ কাঁদবে না। কারণ, আমি মরব না।"

"বটে!" বলে হাবু খানিক অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলল, "মরবে না কেন বল তো! তোমার কি কর্ণের মতো কবচ-কুণ্ডল আছে নাকি?"

"আমার নেই। তবে শুনেছি নাকি আপনার আছে। লোকে বলে আপনি নাকি মেলা ম্যাজিক জানেন।"

হাবু একটা শ্বাস ফেলে বলল, "বাপু, তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম, যদি আত্মীয়স্বজন থেকে থাকে— তবে বরং ছুটি নিয়ে গিয়ে তাদের দেখে এসো গে। শেষ দেখা।"

"তার দরকার নেই।"

হাবু হেসে বলল, "দারোগা, তোমার বড্ড বাড় হয়েছে হে। সে যাকগে, বাঘটা মারলে কি করে বল তো?"

গদাই হাই তুলে বলল, "বাঘ আমি অনেক মেরেছি। তবে আপনার বাঘকে আমি মেরেছি একথা কে বলল?"

"মারোনি?"

"তা বলছি না। বলছি, আমিই যে মেরেছি তার প্রমাণ কী?"

"তবে কি বলতে চাও আমার বাঘটা জঙ্গলে পালিয়ে গেছে? আর যাওয়ার সময় তোমাকে ভালবেসে নিজের চামড়াটা খুলে দিয়ে গেছে?"

গদাই উদাসভাবে বলল, "তাও হতে পারে!"

হাবু তখন গম্ভীর হয়ে বলে, "তাহলে খুব ভাল কথা। আমি আমার সেই চামড়া ছাড়ানো বাঘকে আবার জঙ্গল থেকে ধরে আনব। আর এলে তার গায়ে তোমার শরীরের চামড়াটা খুলে নিয়ে পরিয়ে দেব। তৈরি থেকো।"

গঞ্জের সকলেরই বিশ্বাস: হাবু যা বলে তাই করে। সুতরাং শিগগিরই গদাই দারোগার চামড়া পরানো বাঘকে এই অঞ্চলে দেখা যাবে এই আশায় সবাই চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক রাতে বিকট শব্দ শোনা গেল—ঘ্যা-ড়-ড়-ড়া-ম্! সেই শব্দে মাটি কেঁপে ওঠে, বাড়িঘরের দরজা-জানালা নড়ে যায়, আর মানুষের প্রাণপাখি ধুকপুক করতে থাকে। এরকম বিকট বাঘের ডাক কেউ কখনো শোনেনি। তবে কি সত্যিই হাবুর চামড়া-ছাড়ানো বাঘটা ফিরে এল নাকি?

ওদিকে গোঁসাইবাগানের পোড়ো বাড়িতে হাবু আর তার স্যাঙাতরাও চমকে উঠে বসেছে। কান পেতে শুনছে সবাই। বাঘটা খুব কাছ থেকে ডাকল যেন!

প্রথম রাতে বাঘটা সেই একবারই ডেকেছিল।

তারপর ডাকল আর এক রাতে। হাবু সেদিন ময়নাগুড়ির তামাকের কারবারী ঘনশ্যাম বাজোরিয়ার গদিতে চিঠি দিয়ে এসেছিল, একশটি গিনি আর নগদ বিশ হাজার টাকা গোঁসাইবাগানের তেঁতুলতলায় রাত বারোটার পর পৌঁছে দিতে হবে। এ-ব্যাপারে কেউ কোনো আপত্তি করে না। অনেকে তো খুশি হয়েই হাবু যা চায় তা দিয়ে দেয়। কারো কারো ধারণা, হাবুকে দিলে পুণ্য হয়। ঘনশ্যামজী অবশ্য সেই দলের লোক নন। একশ গিনি আর বিশ হাজার টাকা তো কম নয়! তবু উপায়ান্তর নেই বলে তিনি রাত বারোটা নাগাদ একটা পুরনো গাড়িতে চড়ে, ড্রাইভার আর একটা চাকরসহ তেঁতুলতলায় এসে অন্ধকারে অপেক্ষা করছেন। প্রচণ্ড শীত, মশা, আর ভয়।

রাত বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় গহিন অন্ধকার থেকে একটা কালো মূর্তি এগিয়ে এল। ঘনশ্যামজী কাঁপতে কাঁপতে মূর্তির হাতে গিনি আর টাকার বাক্স তুলে দিলেন। ঠিক সেই সময়ে খুব কাছ থেকে সেই বিকট বাঘের ডাক শোনা গেল—ঘ্যা-ড়-ড়-ড়-ড়া-ম্!

ঘনশ্যামজী মূর্ছা গেলেন। চাকর আর ড্রাইভার পালাল। আর অন্ধকারের মধ্যে হাবু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভিতু মানুষ নয়, তার ওপর অনেক ক্ষমতাও সে রাখে। তবু একেবারে কানের কাছে এ বুক-কাঁপানো ডাক শুনে কয়েক মুহূর্ত বুঝি তার ধন্দ লেগেছিল।

তারপরই টর্চ জ্বেলে সে অবাক হয়ে দেখে, একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে প্রকাণ্ড একটা বাঘের ডোরা দেখা যাচ্ছে। আর সেই বাঘের পিঠে একটা মানুষ না? কী আশ্চর্য! বাঘের পিঠে বসে আছে স্বয়ং গদাধর দারোগা!

বাঘটা আর একবার ডেকে উঠল সেই সময়ে। অবাক ও বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাবুর হাত থেকে টর্চবাতি পড়ে গেল। সেই অন্ধকারে বাঘের পিঠে চেপে গদাধর যে কোনদিকে চলে গেল তা আর ঠাহর পেল না হাবু।

সেই থেকে হাবুর হাঁকডাক যেন একটু কমল। আর আগের মতো বুক চিতিয়ে চলল না কয়েকদিন। সেই রাতের ঘটনার দুই দিন পর এক সকালে গদাইয়ের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়ে বলল, "কায়দা-টায়দা সবই শিখে গেছ দেখছি!"

গদাই গম্ভীর স্বরে বলল, "আপনিই শিখিয়েছেন।"

হাবু তেমন কিছু বলল না। কেবল 'আচ্ছা দেখা যাবে' গোছের কী একটু অস্পষ্ট স্বরে বলে কেটে পড়ল। সে আর গদাই দারোগার চামড়া ছাড়ানোর কথা বলত না।

এদিকে গদাই রোজ রাম কবিরাজের কাছে যায়। কবিরাজ মশাই তাকে নিয়ম করে নানা অনুপান দিয়ে হরেকরকম পাঁচন খাওয়ান। তাতে গদাইয়ের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, মাথা ঠাণ্ডা হয়, সাহস আসে। একদিন

রাম কবিরাজ বলেই ফেললেন, "বুঝলে বাবা গদাই, হাবু মনে হয় এবার এ-জায়গা ছেড়ে শটকাবার তালে আছে। যদি শটকে পড়ে, তাহলে কিন্তু ওকে আর শিক্ষা দিতে পারবে না। এইবার মোক্ষম ঘা দাও।"

কথাটা মিথ্যে নয়। ক'দিন হল হাবুর মনে হচ্ছে, এ জায়গায় যথেষ্ট রোজগার করা হয়েছে। তাছাড়া গদাই দারোগা লোকটাও তেমন সুবিধের ঠেকছে না। অন্য পাঁচটা দারোগা যেমন ভয় পেত, এ তেমন পায় না। নতুন জায়গায় গেলে রোজগারেরও সুবিধে, আর ভাবনাচিন্তাও কম করতে হবে। এই ভেবে সে স্যাঙাতদের তৈরি থাকতে হুকুম দিল। বলল, "এ জায়গাটা বড় গরম আর শুকনো হয়ে গেছে রে। তৈরি থাকিস সব, হুট করে একদিন গাঁটরি বাঁধতে হবে।"

চলে যাওয়ার আগে হাবু সবচেয়ে মোটা দাঁও মেরে যাওয়ার লোভে সতেরোটা চা বাগানের মালিক টমসন সাহেবের বাচ্চা ছেলেকে চুরি করে লুকিয়ে রাখল। সাহেবকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল, "এক লক্ষ টাকা আগামী অমাবস্যার রাতে আপনার বাড়ির পিছন দিকের বাগানে ঝুমকো জবাগাছের নীচে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেবেন। নয়তো রাত ভোর হওয়ার আগেই মা কালীর সামনে বলি হিসেবে আপনার ছেলেকে উৎসর্গ করা হবে।"

সাহেবরা সহজে ভয় খায় না বটে, কিন্তু টমসন সাহেবের ব্যাপারটা অন্যরকম। মাত্র এক বছর আগে তাঁর বউ মারা গেছে। মা-হারা তিনটি সন্তানের জন্য তাঁর গভীর মায়া ছিল। তাই ছেলে চুরি যাওয়ার পর রেগে আগুন হয়েও তিনি খুব শক্ত হতে পারলেন না।

কী হয়েছিল তা সবাই সঠিক জানে না। তবে টমসন সাহেবের বাগানে জবাগাছের নীচে এক লক্ষ টাকা রাখা ছিল এবং যথাসময়ে হাবুর কোনো চেলা এসে সেটা নিয়েও যায়।

লোকে, আবার অন্য কথাও বলে। বলে যে, হাবুর চেলা এসেছিল ঠিকই, তবে সে আর ফিরে যায়নি, গদাই তকে হাত-পা বেঁধে চালান করে দিয়ে, নিজেই সেই চেলা সেজে হাবুর আস্তানায় গিয়ে ঢুকেছিল।

তারপর এক তুলকালাম কাণ্ড। মুহুর্মুহু বাঘের ডাক, বন্দুকের আওয়াজ, চিৎকার। সব লোক জেগে শুনছে।

পরদিন চাউর হয়ে গেল, হাবু বমাল ধরা পড়েছে। ধরা পড়ার আগে সে নাকি খুব এক হাত লড়েছিল গদাইয়ের সঙ্গে। হয়তো বা অন্য সময় হলে সে গদাইকে গদার মতো ঘুরিয়ে আছাড় দিত। কিন্তু রাম কবিরাজের পাঁচন খেয়ে-খেয়ে তখন গদাইয়ের তেজই আলাদা।

করালী স্যারের অঙ্কের ক্লাস। ছাত্ররা এখন আর অঙ্ককে অঙ্ক বলে না, বলে ভয়াঙ্ক। ভয় আর অঙ্ক সন্ধি করে এই নতুন শব্দটা তারা বানিয়ে নিয়েছে।

তা ভয়াঙ্কই বটে। ক্লাসে যেসব অঙ্ক করানোর কথা, সেসব তো আছেই, তাছাড়াও করালীবাবু ছাত্রদের অঙ্কে পোক্ত করে তুলবার জন্য বাইরের বই থেকে যত রকম ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে এসে ছাত্রদের দেন।

আজ করালীবাবু ক্লাসে এসে হাসি-হাসি মুখে বললেন, "মাই লিটল ফ্রেন্ডস, কাল ভোর রাতে আমি স্বপ্নে একটা অঙ্ক পেয়েছি, খুব ইন্টারেস্টিং।"

ছেলেরা নড়ে-চড়ে বসল, কালীবাবু স্বপ্নে অঙ্ক পান, এটা খুব বেশি নতুন কথা নয়। এর আগেও বহুবার তিনি স্বপ্নে অঙ্ক পেয়েছেন। তবে কিনা করালীবাবুর কাছে যেটা সুখ-স্বপ্ন, সেটাই তাঁর ছাত্রদের কাছে দারুণ দুঃস্বপ্ন!

করালীবাবু বললেন, "বুঝলে, ভোররাতে দেখি আমি একটা জুতোর দোকানের কর্মচারী হয়ে কাজ করছি।"

বুরুন লাস্ট বেঞ্চে বসে ছিল। আজকাল সে এখানেই বসে। অঙ্কে ফেল করার পর থেকে সে ভাল ছেলেদের সঙ্গে ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে লজ্জা পায়। পিছনের বেঞ্চে ছাত্র কম, বুরুনের পাশে আর-একজন মাত্র বসে আছে, সে হল ফটিক। কালীবাবুর কথা শুনে ফটিক বিড়বিড় করে বলল, "খুব ভাল হত তাহলে। বাঁচতুম।"

বুরুন জবাব দিল না, আজকাল সব সময়ে তার মন খারাপ থাকে।

করালী স্যার হেসে বললেন, "বুঝলে সবাই! জুতোর দোকানের কর্মচারী। তা আমার বেশ ভালই লাগছিল। দোকানের মালিকটি ভালমানুষ গোছের, হিসেব-টিসেব বোঝে না। লাভ-ক্ষতি বা লেনদেনে হিসেবের গোলমাল বুঝলেই আমাকে ডেকে জিগ্যেস করে, আচ্ছা কালীবাবু, হিসেবটা কী হবে বলে দিন তো! যাই হোক, কাজটা আমার বেশ ভালই লাগছিল। খদ্দের এলে জুতো বের করছি, পরাচ্ছি, পছন্দ হল বা ফিট করল কিনা দেখছি, মাঝে-মাঝে মুখে-মুখে অঙ্ক কষে মালিককে হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছি। বেশ লাগছে। এমন সময়ে এক খদ্দের এলেন। একজোড়া জুতো তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। দরদস্তুর করে কুড়ি টাকায় রফা হল। তিনি মালিককে একশো টাকার একটা নোট দিলেন। মালিকের ক্যাশ বাক্সে তখন অত টাকা ছিল না, আমাকে নোটটা দিয়ে বললেন, করালীবাবু পাশের দোকান থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে আনুন তো।... লিটল ফ্রেন্ডস, তোমরা খুব মন দিয়ে ট্রানজ্যাকশানগুলো লক্ষ করো। ...হ্যাঁ, তারপর আমি তো পাশের দোকানে গিয়ে একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে এনে মালিককে দিলাম। মালিক কুড়ি টাকা রেখে খদ্দেরকে আশি টাকা ফেরত দিলেন। খদ্দের জুতোর বাক্স বগলে নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু একটু বাদেই পাশের দোকানের মালিক এসে সেই একশো টাকার নোটটা আমার মালিককে ফেরত দিয়ে বললেন, মশাই, এ নোটটা জাল, এটা বদলে দিন। মালিক নোটটা ভাল করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন, তাই তো, বড্ড ঠকিয়ে গেছে দেখছি! এই বলে মালিক ক্যাশ বাক্স থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে একশো টাকা নিয়ে দিয়ে দিলেন। পাশের দোকানের লোকটা চলে গেল। তারপর মালিক অনেকক্ষণ অঙ্ক কষে বের কাবার চেষ্টা করলেন তাঁর কত ক্ষতি হল। কিন্তু লোকটা ভারি বোকাসোকা ভালমানুষ গোছের, তাই কিছুতেই হিসেব মেলে না। একবার উঁ-হু-হু করে উঠে বলেন, ও বাবা, আমার দুশো টাকা লস হয়েছে। আমি জিগ্যেস করলাম, কি করে? তিনি বললেন, খদ্দেরকে আশি টাকা দিলাম, দোকানদারকে একশ টাকা, আর এক জোড়া জুতো—দুশো দাঁড়াচ্ছে। আবার বলেন, না না, মোট আশি টাকা গচ্চা গেছে দেখছি...ঐ যাঃ, হিসেবের ভুল, একশো টাকা আর কুড়ি টাকার জুতো, মোট একশো কুড়ি টাকা

গেল। আবার বলেন, না, না, এক জোড়া জুতো ছাড়া আর তো আমার কিছুই যায়নি...না না, আবার সেই ভুল! দোকানদারকে যে একশো টাকা দিলুম।...যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে বললেন, করালীবাবু, আমার কত দণ্ড গেল তা একটু হিসেব করে বলে দেবেন?...মাই ফ্রেন্ডস, আজকের প্রথম অঙ্ক এটাই। ভেরি সিম্পল অ্যারিথমেটিক। বলতে গেলে ক্লাস টু-র অঙ্ক। জলবৎ তরল। তিন মিনিট সময় দিচ্ছি, কষে ফেল।"

সবাই খাতা খুলে খস খস করে কষে ফেলছে।

বুরুনও কষে ফেলল। বেশি সময় লাগেনি তার। মিনিট দেড়েক বড়জোর। খাতা নিয়ে করালীবাবুর কাছে জমা দেবে বলে যখন উঠতে যাচ্ছে, তখন কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলল, "আঃ, যাচ্ছেতাই ভুল করলে যে! করালীবাবুর ডাস্টারের বাড়ি খেতে যাচ্ছ নাকি?"

বুরুন প্রথমে ভেবেছিল, ফটিক কথা বলছে। কিন্তু চেয়ে দেখল, ফটিক বেঞ্চের একেবারে ওই প্রান্তে বসে গোয়েন্দা-গল্পের বই পড়ছে চুরি করে।

তবে কে বলল কথাটা?

কানের কাছে কে যেন ফিক করে একটু হেসে বলে ওঠে, "ভয় পেলে নাকি?"

বুরুন তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে নিচু স্বরে বলে, "আমি কাউকে ভয় খাই না।"

না-দেখা লোকটা তখন গলার স্বরটা খুব দুঃখের করে বলল, "তুমি দেখছি খুব উদ্ভট ছেলে। যাকগে, কী আর করা! বরং তোমার একটু উপকার করে দিয়ে যাই। দাও খাতাটা, অঙ্কটা কষে দিই। "

বুরুন একটু ইতস্তত করে বলল, "খাতাটা দিলে করালীবাবু দেখতে পাবেন যে!"

"তাহলে তুমি খাতা খুলে পেনসিল ধরে বসে থাকো, আমি তোমার হাত ধরে ধরে লিখিয়ে দিই।"

তাই হল। দশ সেকেন্ডের মধ্যে অঙ্কটা ঠিকঠাক কষে দিয়ে অদৃশ্য নিধিরাম তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, "যাও, সবার আগে গিয়ে দেখিয়ে আনো।"

(অঙ্কের উত্তর এখানে দেওয়া হল না। পাঠক-পাঠিকারা সেটা বের করবে।)

বুরুন গিয়ে করালী স্যারকে খাতা দেখাতেই তিনি তার পিঠ চাপড়ে বললেন, "দারুণ!"

আরো কয়েকজন অঙ্কটা তিন মিনিটের মধ্যে ঠিকঠাক কষেছিল, কালী স্যার সকলের পিঠ চাপড়ে দিলেন। করালীবাবু ওইরকমই, খুব সোজা অঙ্কও কেউ করে দিতে পারলে ভীষণ খুশি হয়ে ওঠেন।

পরের অঙ্কটা একটু কঠিন, একটা কিম্ভূত গাড়ির চারটে চাকা চার রকম, একটার ব্যাস তিন ফুট তিন ইঞ্চি, আর একটার তিন ফুট আট ইঞ্চি, তৃতীয়টার চার ফুট দুই ইঞ্চি, চতুর্থটির ব্যাস দুই ফুট এগারো ইঞ্চি, এই কিম্ভূত গাড়িটা যদি পাঁচ মাইল যায় তবে চারটে চাকার কোন্‌টা কতবার সম্পূর্ণ এবং কতখানি আংশিক আবর্তিত হবে? করালীবাবু এটার জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ করলেন।

সবাই অঙ্ক কষতে ব্যস্ত। কিন্তু বুরুনের সে ভাবনা নেই। সে অঙ্কটা খাতায় টোকামাত্র নিধিরাম তার হাত ধরে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে অঙ্কটা কষে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, "যাও।"

বুরুনকে খাতা হাতে টেবিলের কাছে আসতে দেখে করালীস্যার হাঁ হয়ে গেলেন। খাতা দেখে আরো তাজ্জব। বললেন, "এটা তোমার আগে থেকে কষা ছিল!"

"আজ্ঞে না স্যার, এই মাত্র করলাম।"

"বটে! তাহলে বলতে হয় তোমার ভাগ্যে স্বর্ণপদক রয়েছে।"

এর পরের অঙ্ক চৌবাচ্চায় জল ঢোকা আর বেরোনো নিয়ে, এটা কষতে বুরুনের লাগল তেরো সেকেন্ডের মতো। করালীবাবু অঙ্কে রাইট দিয়ে বললেন, "তুমি অ্যানুয়েলে অঙ্কে যেন কত পেয়েছিলে! বারো না তেরো কী একটা বোধহয়! না হে, তোমার সেই খাতাটা আবার আমাকে দেখতে হবে।"

করালীস্যারের পর অবনীবাবুর ট্রানস্লেশন ক্লাস। তিনি ইংরিজি করতে দিলেন 'কুল খাইয়া রমেনের দাঁত টকিয়া গিয়াছে'। 'ভবানী পাঠক তো সোজা পাত্র নয়, সে ভালর ভাল মন্দের যম'। 'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ, গিরি, ইহার শিখরদেশ সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় সমাচ্ছন্ন...ইত্যাদি।

সবাই কলম কামড়াচ্ছে।

ঠিক চল্লিশ সেকেন্ড বাদে নিধিরাম বুরুনকে ঠেলে দিয়ে বলল, "যাও, হয়ে গেছে।"

বুরুন গেল। অবনীবাবু খাতা দেখে মাথা চুলকে বললেন, "ইংরিজিতে তুই কাঁচা নোস ঠিকই, কিন্তু এত ভাল ইংরিজি বহুকাল কোনো ছাত্রকে লিখতে দেখিনি। বাঃ বাঃ। এরকম চালিয়ে গেলে তুই স্কলারশিপ পাবি যে রে!"

বুরুন খুব লজ্জার ভঙ্গিতে মাথা নত করে থাকে।

বছরের শুরু, ক্লাস এখনো পুরোপুরি হয় না, পঞ্চম ঘণ্টার পর ছুটি হয়ে গেল। গেম টিচার দুই সেট ক্রিকেটের সরঞ্জাম বের করে দিলেন।

ইস্কুলের পাশে পেল্লায় মাঠে হই-হই করে ক্রিকেট নামল। এক দিকে নিচু ক্লাসের ছেলেরা পার্টি করে খেলছে। অন্য ধারের টিমটা কিছু অদ্ভুত। এতে ফেল করা ছাত্রদের সঙ্গে পাশ করা ছাত্রদের ম্যাচ, গেম স্যার টিম ঠিক করে দিয়েছেন।

বুরুন অঙ্কে ফেল করলেও ক্লাসে উঠেছে। তাই সে পাশ-করাদের দলে। কিন্তু পাশ-করা ভাল ছেলেরা খেলাধুলোয় তেমন মজবুত নয়। অন্য দিকে ফেল-করা ছেলেরা সব সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক প্লেয়ার। তারা যেমন দুর্দান্ত ব্যাট করে, তেমনি দুর্ধর্ষ বল। তারা ছোটে, লাফায়, গড়াগড়ি খায় অনায়াসে। তাই আজ খেলার মাঠে পাশ করাদের বড় দুর্দিন।

পাশ-করারা ব্যাট করতে নামল টসে জিতে। প্রথম ওভারেই দুজন জখম হয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বসে পড়ল। দুজন বোল্ড আউট হয়ে গেল। দ্বিতীয় ওভারে আরো একজন আউট, তবে তিনটে রান হল। তৃতীয় ওভারে পর-পর দুজন ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেল, একজন ভয়ে দান ছাড়ল।

বুরুন ব্যাট ভাল করে না, তবে বল সে ভালই করে। কিন্তু আটজন বসে পড়ায় তাকে ব্যাট করতে নামতেই হয়।

যখন মাঠে নামছে বুরুন, তখন কানের কাছে ফের সেই ফিসফিসানি, "কোনো ভয় নেই, আমি আছি।"

বুরুন গম্ভীর হয়ে বলল, "হুঁ।"

"সেঞ্চুরি করিয়ে দেবো। কিন্তু খোকা, মনে রেখো আমার প্রেস্টিজটা তোমাকে রাখতে হবে।"

"দেখা যাবে।"

বুরুন নেমে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিল, ফেল-করা হুমদো-হুমদো ছেলেরা হাসাহাসি করছে। ফাস্ট বোলার ভুতু তাকে উদ্দেশ করে বলে, "নে, আর দেখতে হবে না। যে পথে এসেছিস, সে পথটাই ভাল করে দেখে রাখ। এক্ষুনি ফিরতে হবে তো।"

ভুতুর দুর্দান্ত বলটা এল। বুরুনকে কিছুই করতে হল না। ব্যাটটা কে যেন তার হয়ে চালিয়ে দিল। আর বলটা জেট প্লেনের মতো ছুটে গিয়ে ইস্কুলবাড়ির দোতলার ছাদে পড়ল। ছক্কা।

আনতাবড়ি মার হয়ে গেছে ভেবে কেউ খুব একটা হাততালি দিল না।

কিন্তু পরের বলটা আবার উড়ে গিয়ে মস্ত শিরীষ গাছে একটা পাখির বাসা ভেঙে নিয়ে পড়ল। ছক্কা।

এবার কিছু ক্ষীণ হাততালি, বুরুনদের ক্যাপটেন অনিরুদ্ধ নিজের ঠ্যাঙের ব্যথার জায়গায় হাত বোলাতে-বোলাতে মাঠের বাইরে থেকে চেঁচাল, "বুরুন, চালিয়ে যা।"

তা, চালাল বুরুন। তৃতীয় বলটা এমন হাঁকড়াল যে, সেটা গিয়ে ইস্কুলের পাশে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির নারকোল গাছের ডগায় গিয়ে একটা ঝুনো নারকোল সমেত নেমে এল। পণ্ডিতমশাইয়ের বুড়ি পিসি বেরিয়ে এসে চেঁচাতে লাগলেন, "কে রে ডানপিটে বদমাশ। গাছে ঢিল মেরে নারকোল পাড়িস দুক্কুরবেলা? দাঁড়া, হরকে বলে তিন ঘণ্টা নিলডাউন করিয়ে রাখব?"

পণ্ডিতমশাইয়ের নাম হরপ্রসাদ। পান থেকে চুন খসলেই ছাত্রদের নিলডাউন করিয়ে রাখেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের পিসিমা এক হাতে নারকোল অন্য হাতে বলটা কড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ওই দেখ, নারকোলের সঙ্গে একটা বেলও পড়েছে দেখছি, তা এ-বাড়িতে তো বেলগাছ নেই, তবে বেল এল কোত্থেকে?"

হর-স্যারের পিসির হাত থেকে বলটা উদ্ধার করা খুব শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিলডাউন হওয়ার ভয়ে কেউ এগোতে সাহস পাচ্ছে না। খেলা পণ্ড হওয়ার জোগাড়।

বুরুন ফিসফিস করে বলল, "ও নিধিরাম, যাও না বলটা নিয়ে এসো।"

নিধিরাম বুরুনের কানে কানে বেশ রাগ করে বলে উঠল, "বড় যে নাম ধরে ডাকছ! তোমার চেয়ে বয়সে আমি কত বড় জানো? দুশো বছরের বড়। সেটা খেয়াল রেখো।"

বুরুন ফিক করে হেসে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা। নিধিদা বলে ডাকব তাহলে।"

মুহূর্তের মধ্যে একটা ঘূর্ণি হাওয়া উঠে মাঠ পেরিয়ে হর-পণ্ডিতের বাড়ির দিকে ধেয়ে গেল। স্যারের পিসি কিছু বোঝবার আগেই ঝটকা বাতাসে হাতের বলটা ছিট্‌কে আবার মাঠের মধ্যে চলে এল। স্যারের পিসি চেঁচাতে লাগলেন, "ঐ যাঃ, গেল এমন পাকা বেলটা। কী সুন্দর গন্ধ-ওঠা বেলটা ছিল, ভাবলুম আজ পানা করে হরকে খাওয়াব। বাছার পেটটা ভাল যাচ্ছে না..."

পরের ওভার করতে এল কেষ্ট। তার চেহারা দানবের মতো। বল করে না কামান দাগে তা বোঝা শক্ত। তবে ইস্কুলেরই শুধু নয়, এই জেলার সে-ই সবচেয়ে বিপজ্জনক বোলার। তার বলে হয় স্টাম্প ভাঙে, নয় তো ব্যাটসম্যানের পা, আর এ দুটোতে না লাগলে নিঘাত উইকেটকিপারের পাঁজর ফাটবে। তাই কেষ্ট বল করার সময় সবাই ভারি গম্ভীর হয়ে যায়।

তবে কিনা ইস্কুলের এলেবেলে খেলায় সে ইচ্ছে করেই বেশি জোরে বল করে না। আজও সে প্রথম বলটা বেশ আস্তেই দিল। সেই বলে বুরুনের পার্টনার ব্যাট ছুঁইয়ে একটা রান করল। কেষ্টর দ্বিতীয় বলটাও বেশ আস্তের ওপর ছিল। তবে কি না তার কাছে আস্তে হলেও বলটা তেমন আস্তে বলে আর কারো মনে হল না। একটা লাল সাপের মতো সেটা ধেয়ে এসেই ছোবল তুলল বুরুনের বুকে।

বুরুনের ব্যাট হেলাভরে ওপরে উঠে এমন লাথি লাগাল সাপটাকে যে, সেটা লেজ গুটিয়ে পাখি হয়ে উড়ে গেল মেঘের দেশে। তারপর চিৎপাত হয়ে পড়ল পাশের মাঠে, যেখানে বাচ্চা ছেলেরা খেলছে। সে-মাঠেও একটা ছেলে ব্যাট হাঁকড়েছে। তাই বলটা কোন্ দলের তাই নিয়ে একটু গোলযোগ বেধে উঠল।

মার খেয়ে কেষ্ট রেগে যাচ্ছে। তিন নম্বর বলটা সে খুব জোরে না হলেও বেশ জোরে দিল। পিচের ওপর বিদ্যুৎ খেলিয়ে সেটা ছুঁতে এল বুরুনকে। কিন্তু বুরুনের ব্যাট আজ বজ্রাদপি কঠোর। বলটাকে এমন ঘাড়ধাক্কা দিল যে, সেটা কাঁচুমাচু হয়ে ফের বাতাসে সাঁতরে মাঠ পার হয়ে, ইস্কুলের দেয়ালের চুনবালি খসাল খানিক। দেয়ালের ভাঙা জায়গাটা আফ্রিকার ম্যাপ হয়ে গেল।

পাঁচ মিনিটে বুরুনের ত্রিশ রান। চারদিকে ফটাফট হাততালি পড়ছে।

কেষ্ট আস্তিন গুটোয়, বুক ভরে দম নেয়। তারপর মাঠের শেষপ্রান্তে গিয়ে তার বল করার দৌড় শুরু করে। তার মানে এবার কেষ্ট তার সবচেয়ে জোরালো বল দেবে।

বুরুন নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকে। কেষ্টর বলটা সে অবশ্য ভাল করে দেখতেও পায় না। কিন্তু ব্যাট যখন বলটার গায়ে লাগল, তখন তার মনে হল, ব্যাটটা বুঝি ভেঙেই যাবে।

সারদাচরণবাবু জমিদার। তাঁর বাড়ির মাথায় একটা পাথরের পরী দিব্যি ডানা মেলে একশো বছর কাটিয়ে দিয়েছে। বজ্জাত বলটা গিয়ে পরীর একটা ডানা ভেঙে তবে থামল।

আবার ছক্কা।

কেষ্টর পাঁচ নম্বর বলটা আগেরটার চেয়েও জোর। সেই তেজে বলটা প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় কখন যে এসেছে, আর কখন যে ব্যাটটা তাকে বেতিয়েছে তা বুরুন জানে না। তবে এবার সেটা গিয়ে একটা খড়-

বোঝাই গরুর গাড়ির খড়ের গাদায় সেঁধিয়ে গেল। বলটা এত মারধর পছন্দ করছিল না বোধ হয়, গা ঢাকা দেওয়ার তালে ছিল।

বহু কষ্টে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে গাড়ি থামিয়ে বলটা উদ্ধার করতে হল। সেই ফাঁকে পাশ-করা ছেলেরা এসে বুরুনকে কাঁধে নিয়ে খানিক ধেই-ধেই করে নেচে নেয়। মাঠের বাইরে গিয়ে তারাই আবার ফেল-করা ছাত্রদের বক দেখায়।

বিয়াল্লিশ থেকে একশো দুইয়ে পৌঁছতে লাগল মোটে বারো মিনিট। সর্বসাকুল্যে সাতাশ মিনিটে সে সেঞ্চুরি করেছে এবং এখনো আউট হয়নি।

ইতিমধ্যেই তার ব্যাট করার খবর পেয়ে প্রথমে গেম টিচার এবং তারপর হেডস্যার সমেত সব মাস্টারমশাই মাঠের ধারে চলে এসেছেন। শহরের লোকজনও খবর পেয়ে চলে আসছে। মাঠের চারধারে তুমুল ভিড় হয়ে গেল দেখতে-না-দেখতে।

বুরুনের একটু লজ্জা লজ্জা করছে বটে। কিন্তু সে করবে কী?

সতেরোটা ওভার বাউন্ডারি মেরে একশো দুইয়ের পরও বুরুনকে আবার ধুন্ধুমার ব্যাটের চমক দেখাতে হল। দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করতে বুরুন সময় নিল পঁচিশ মিনিট, আবার সতেরোটা ছক্কা মেরে। আউট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

খুঁতখুঁতে গেম টিচার পর্যন্ত বললেন, "ব্র্যাডমানেরও এরকম রেকর্ড নেই। এ তো ক্রিকেট ইতিহাস পাল্টে দেবে।"

ভাল ছেলেরা আড়াইশোতে দান ছাড়ার পর ফেল-করারা ব্যাট করতে এল। বুরুনের হাতে বল। তার কানে-কানে নিধিরাম বলল, "চিন্তা নেই।"

তা চিন্তা ছিল না ঠিকই। ফেল-করা ছেলেরা ছয় রানে অল ডাউন। বুরুন দুই ওভারে মোট দশটা বল করেছিল, দ্বিতীয় ওভারে চারটের বেশি বল করার দরকারই হয়নি তার। প্রতি বলে একটা করে উইকেট পড়েছে। ট্রিপল হ্যাট্রিক সমেত তার বোলিংয়ের হিসেব ১.৪ ওভার, ২ মেডেন ০ রান, ১০ উইকেট। তার দু' ওভারের মাঝখানে একজন আনাড়ি ছেলে এক ওভার বল করেছিল, তাইতে ফেল-করারা ছয় রান নেয়।

গেম স্যার বললেন, "ওয়ার্লড রেকর্ড।"

কিন্তু তাঁর বিস্ময়ের এই সবে শুরু। এ তো গেল ক্রিকেটের বৃত্তান্ত।

ঠিক পনেরো দিন পরে স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টস। খুব তোড়াজোড় করে স্পোর্টস হয় স্কুলে। কারণ স্কুল স্পোর্টসের পরই জেলা স্পোর্টসে স্কুল থেকে ছাত্রদের বাছাই করে পাঠানো হয়। এ-স্কুলের পড়াশুনোয় যেমন, খেলাধুলোতেও তেমনই সুনাম।

বুরুন প্রতি বছরই স্পোর্টসে একটি-দুটি প্রাইজ পায়। বলার মতো তেমন কিছু নয় অবশ্য। তার গ্রুপে সে হাইজাম্পে গতবারও থার্ড প্রাইজ পেয়েছিল, আর দুশো গজ দৌড়ে সেকেণ্ডও হয়েছিল। কিন্তু স্কুলের নামকরা ভাল অ্যাথলেটদের তুলনায় সেগুলো কিছুই না।

স্পোর্টসের দিন দশেক আগে হিট হচ্ছে।

কতকগুলো বিষয় গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর গোটা দুই-তিন বিষয় আছে, যা সকলের জন্য। বুরুন তার গ্রুপের সব রকম দৌড় আর লাফে নাম দিল। তাছাড়া দশ হাজার মিটার দৌড়, সাইকেল রেস আর লোহার ভারী গোলা ছোঁড়ার যে বিষয়গুলি সকলের জন্য, তাতেও নাম লেখাল। ক্রিকেটে তার এলেম দেখার পর স্পোর্টসে এতগুলো বিষয়ে নাম লেখানোতে কেউ ভ্রূ কোঁচকাল না, বুরুনের ভিতর কী আছে তা তো কেউ জানে না।

হিট শুরু হওয়ার দিনই নিধিরাম উৎসাহের চোটে এমন কেলেঙ্কারি করে বসল যে, বুরুন লজ্জায় মরে যায় আর কী!

প্রথম বিষয় ছিল একশো মিটার দৌড়। গেম স্যার স্টপ ওয়াচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট গেম স্যার হুইসিল বাজিয়ে দৌড় শুরুর সংকেত দেওয়ামাত্র বুরুনের মনে হল, একটা ঝড়ের বাতাস তাকে প্রবল বিক্রমে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন হল যে, বুরুনের পা প্রায় মাটিতেই ঠেকল না।

দৌড়ের শেষে গেম স্যার মাঠে বসে পড়ে নিজের মাথা চেপে ধরে বললেন, "একশো মিটার মাত্র আট সেকেন্ডে! উঃ, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।"

সত্যিই অজ্ঞান হয়ে যেতেন, বুরুন গিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে বলল, "না স্যার, আট সেকেন্ডে নিশ্চয়ই নয়। স্টপ ওয়াচটা বোধহয় খারাপ।"

গেম স্যার ভ্যাবলা দুটো চোখে চেয়ে বললেন, "বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার?"

"ঠিক তো?"

"ঠিকই। অত জোরে আমি দৌড়োইনি।"

গেম স্যার উঠে বললেন, "দৌড়োলে মুশকিল হত। কারণ, ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও ওর চেয়ে অনেক বেশি কিনা।"

হাই জাম্পের আগে বুরুন আড়ালে গিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "নিধিদা, এসব কী হচ্ছে বলো তো! বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু গোঁসাই-সর্দারকে গিয়ে বলে দেব।"

নিধিরাম ভয় খেয়ে বলল, "তা ওয়ার্লড রেকর্ড-টেকর্ড কি আর জানা আছে! আগে থেকে বলবে তো!"

"আচ্ছা, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এবার সাবধান।"

হাই জাম্পে বুরুন চটপট কাঠি পার হতে লাগল বটে, তবে খুব একটা বাড়াবাড়ি করল না। তাতেও অবশ্য কম কিছু হল না, গেম স্যার মেপে দেখলেন, বুরুন শেষ লাফে ছ' ফুট ডিঙিয়েছে এক চান্সে। গেম স্যারকে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

লং জাম্পে বুরুন আরো সাবধান হল। মাত্র বাইশ ফুট লাফিয়ে আর লাফাল না।

গেম স্যার তাকে আড়ালে ডেকে খুব উত্তেজিতভাবে বললেন, "শোনো বুরুন, তোমার ভিতর যে কী সাঙ্ঘাতিক ক্ষমতা ভগবান দিয়েছেন, তা তুমি হয়তো টের পাচ্ছ না! আমি বলে দিচ্ছি, তুমি অলিম্পিক থেকে একাই অন্তত এক ডজন সোনার মেডেল নিয়ে আসবে। এখন থেকে তৈরি হও।"

বুরুন খুব লজ্জার হাসি হাসল। সারা মাঠে তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাকে দেখবার জন্য ছেলেরা ভিড় করছে। শহরের লোকেও চলে আসছে কাণ্ড-কারখানা দেখতে।

স্পোর্টসের দিন দুপুরে মাঠ ভেঙে পড়েছে ভিড়ে। শুধু এ গঞ্জই নয়, আশেপাশের এলাকা থেকে, এমন কী, জেলা-শহর থেকেও গাড়ি করে লোক এসেছে। সবাই কানাঘুষো শুনেছে, গঞ্জে নাকি এক সাঙ্ঘাতিক স্পোর্টসম্যানের আবির্ভাব হয়েছে।

বুরুনের কাণ্ড শুনে দাদুও অবাক। নাতির এত এলেম তাঁরও জানা ছিল না। তিনি নাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য একটা ভাল পাঁচন তৈরি করে খাইয়ে দিয়েছেন। তাতে বুরুনের গায়ে যথেষ্ট জোর এসে গেছে।

এক দিকে দাদুর বলকারক পাঁচন, অন্য দিকে নিধিরাম। দুইয়ে মিলে সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে গেল স্পোর্টসে।

পোলভল্টে বাঁশে ভর করে আকাশের দিকে উঠে গেল বুরুন, আড় হয়ে থাকা বার-এর অন্তত দশ ফুট উঁচু দিয়ে। মাপজোক করলে বাইশ-তেইশ ফুট দাঁড়াবে। মাঠ ফেটে পড়েছে চিৎকারে আর উত্তেজনায়।

একশো মিটার, দুশো মিটার, আটশো মিটার দৌড়, হার্ডল রেস, হাই জাম্প, লং জাম্প, লোহার বল ছোঁড়া—কোন্‌টায় বুরুন সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড না করল? শেষে অন্য সব কম্পিটিটাররা মাঠ থেকে পালাতে লাগল চুপিসাড়ে। লোকে বলাবলি করতে লাগল—"এ তো দেখছি সেই হাবু ওস্তাদের ভুতুড়ে কাণ্ড সব। নইলে ঐটুকু পুঁচকে ছেলে অত জোরে দৌড়তে বা অত উঁচুতে-দূরে লাফাতে পারে নাকি?"

স্পোর্টসের পর বুরুন বাড়ি ফিরল ছেলেদের কাঁধে চড়ে, সঙ্গে প্রাইজের বোঝা। দাদু সব দেখেশুনে বললেন —"হবে না! এ পাঁচন যে আমার নিজের আবিষ্কার! ভেলুদের ডাক্তারী শাস্ত্র ঘেঁটে মরলেও এসব নিদান পাবে না।"

বুরুনের আজকাল কাজকর্ম বড্ড বেড়েছে। সকালে উঠে ঘর ঝাঁটাতে হয়, ন্যাতা দিয়ে মেঝে মুছতে হয়, নিজের পড়ার টেবিল নিজেকে গোছাতে হয়, কুয়ো থেকে স্নানের জল তুলে নিতে হয়, খাওয়ার পর নিজের বাসন মেজে নিতে হয়, সপ্তাহে দু'দিন নিজের জামাকাপড়, বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়ার কাচতে হয়, নিজের জুতো পালিশ করে নিতে হয়, মশারি টাঙাতে হয়। হাজারো কাজ। ভেলু ডাক্তারের হুকুমে তার কাজে সাহায্য করা সবাই বন্ধ করে দিয়েছে। অপমান আরো আছে। অঙ্কে ফেল করায় তার বিছানায় আর তোশক পাতা হয় না। চৌকির ওপর শতরঞ্চি আর চাদর পেতে শোওয়া। পায়ে জুতো পরে বটে, কিন্তু মোজা বারণ, রঙচঙে জামাকাপড় পরা বারণ।

প্রথম প্রথম বুরুনের এতে খুব কষ্ট হত। অভিমানে চোখে জলও এসে যেত। রাতে একা শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।

কিন্তু আজকাল তার কষ্ট আর নেই। ঘুম থেকে খুব ভোর রাতেই উঠে পড়ে সে। নিধিরামই ডেকে দেয়। উঠে দেখতে পায়, নিধিরাম ঘরদোর সাফ করে পড়ার টেবিল গুছিয়ে রেখেছে। স্নানের সময় যখন বুরুন জল

তোলে, তখন আসলে তাকে ভারী বালতি টেনে তুলতে হয় না, দড়িটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, বালতি আপনা থেকে উঠে আসে ওপরে। বাসন মাজতেও তার কোনো কষ্ট নেই, কুয়োপাড়ে গিয়ে এঁটো বাসন রাখতে না রাখতেই মাজা-ধোয়া হয়ে যায়। মশারি আপনা থেকেই টাঙাননা, গোঁজা হয়ে যায়। রাতে শক্ত চৌকিতে শুতে কষ্ট হয় বলে তারও ব্যবস্থা হয়েছে। খুব নরম একটা তোশক কোত্থেকে বিছানায় চালান হয়ে যায় রাতে, আবার সকাল হতেই সেটা লোপাট।

পড়াশুনোর কষ্টও খুব বেশি নেই আজকাল। পড়ে হবে কী? ক্লাসে যত শক্ত প্রশ্নই তাকে করা হোক না কেন, নিধিরাম ঠিক কানে কানে উত্তর বলে দেয়।

বুরুন আজকাল ভারি আয়েসের জীবন কাটাচ্ছে।

তবে কিনা নিধিরাম যে এত খাতির করছে, তারও কারণ আছে।

প্রায় দিনই রাত্রিবেলা নিধিরাম এসে বিছানার ধার ঘেঁষে মেঝেয় বসে ঘ্যানঘ্যান করে বলে, "বুঝলে বুরুন, তুমি দেখছি মহা চালিয়াত ছেলে, কথা দিয়ে কথা রাখো না।"

বুরুন ঘুম-চোখে হাই তুলে বলে, "এখন ঘুমোব, তুমি কেটে পড়ো তো!"

"আহা, ঘুমোবে তো ঠিকই। কিন্তু আমার যে ঘুম কেড়ে নিয়েছ। জানো তো, সেই যে গোঁসাইবাগানে আমাকে হেনস্থা করেছিলে, তারপর থেকে আর ভূতের সমাজে আমার মুখ দেখানোর জো নেই। স্বয়ং গোঁসাইবাবা আমাকে সাফ বলে দিয়েছে, যদি বুরুন কোনোদিন তোকে একটু ভয় খায়, তবেই আবার সমাজে তোর জল চলবে। নইলে খড়ম পেটা করে মামদোদের রাজ্যে তাড়িয়ে দিয়ে আসব।"

"তা আমি করব কী?"

নিধিরাম অভিমানভরে বলে, "তোমার জন্য কত কী করছি, আর তুমি এটুকু আমার জন্য করতে পারবে না?"

"আমার যে তোমাকে ভয় লাগে না, নিধিদা!"

"চেষ্টা তো করতে পারো।"

"দূর! তোমাকে ভয় খাওয়ার কথা ভাবলেই হাসি পায় যে!"

নিধিরাম আঁশটে মুখ করে চলে যায়। তবে দিনরাত ঘ্যানঘ্যান করতেও সে ছাড়ে না।

দাদু আজকাল কথাবার্তা খুব বলেন না, দিনরাত তাঁর গাছ-গাছড়া নিয়ে নানা ভাবনা-চিন্তা। নানারকম নতুন নতুন অরিষ্ট, পাঁচন, চূর্ণ তৈরি করছেন। দিনরাত বনে-জঙ্গলে ঘুরে মূল, ছাল, পাতা সংগ্রহ করছেন। হিরে, মুক্তো, সোনা পুড়িয়ে ভস্ম তৈরি করছেন। মৃগনাভির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছেন, এসব বাতিক তাঁর বরাবরই ছিল। কিন্তু ইদানীং যেন বড় বেশি চিন্তিত দেখাছে তাঁকে।

রবিবার দাদু বুরুনকে ডেকে বললেন, "তোমার তো সব দিক দিয়েই প্রবল উন্নতি হচ্ছে দাদা! লক্ষ করছি, আমি না ডাকতেই তুমি ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে পড়ো, নিখুঁতভাবে সব কাজ করছ ঘড়ির কাঁটা ধরে।"

বুরুন লাজুক ভাব করে মাথা নুইয়ে রইল।

দাদু কাছে টেনে এক হাতে বুকে চেপে ধ'রে, অন্য হাতে মাথায় বিলি কেটে বললেন, "খুব ভাল, খুব ভাল।"

দাদু অনেকক্ষণ তাকে এইভাবে বুকের কাছে ধরে থেকে খুব আস্তে করে বললেন, "দেখ দাদু, বুড়ো হয়েছি, কবে মরে-টরে যাই। তাই ভাবছি, আমার যা-কিছু বিদ্যে, সব এখন থেকেই তোমাকে কিছু কিছু শেখাই।"

এমনিতে দাদুর সঙ্গে বুরুনের সম্পর্ক খুবই ভাল, কিন্তু তা বলে দাদু কখনো এরকমভাবে বুরুনকে আদর করেন না। তাই দাদুর মধ্যে একটা কেমন অসহায় ভাব টের পেয়ে বুরুন অবাক। তার দাদু রাম কবিরাজ কখনো কাউকে ভয় খান না, কারো পরোয়াও করেন না। কিন্তু এখন যেন বুরুন টের পাচ্ছিল যে, দাদু ঠিক আগেকার দাদু আর নেই।

বুরুন নিজে ভারি দুষ্টু ছেলে ছিল বরাবর। অঙ্কে ফেল করার পর থেকেই সে কেমন একটু মুষড়ে পড়েছে। তাই কারো মন খারাপ থাকলে সে টপ করে সেটা টের পেয়ে যায়। তার নিজের যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তার দাদুরও তেমনি একটা কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

বুরুন বলল, 'দাদু, তোমার কি মনটা খারাপ? আমাকে বলো, আমি সব ঠিক করে দেব।"

রাম কবিরাজ খুব চিন্তিত মুখ করে বুরুনের দিকে চেয়ে থাকেন একটু। তারপর মাথা নেড়ে বলেন, "বিপদ বলে বিপদ! কিন্তু আমার নিজের জন্য তো ভাবি না দাদা। বুড়ো হয়েছি, কাজেই মরতে ভয় পাই না! তবে কিনা একটু দুষ্টু লোক এসে সারা শহরটাকেই নষ্ট করে দেবে।"

"দুষ্ট লোক! সে কে?" বুরুন অবাক হয়ে বলে।

"আছে একজন।"

"সে এসে কী করবে?"

"কী করবে তার কি কিছু ঠিক আছে দাদা! তাই আমি ভাবছি, সময় থাকতেই তোমাকে খানিকটা বিদ্যা শিখিয়ে যাই। আর এ বিদ্যা শুধু শিখলেই হবে না, আবিষ্কারকও হতে হয়, উদ্ভাবকও হতে হয়। আয়ুর্বেদে যা আছে, তার বাইরেও আমি অনেক ওষুধ তৈরি করেছি। এ তো গেল একটা দিক। আবার ভাল চিকিৎসক হতে গেলে শুধু রোগ আর ওষুধ চিনলেই হবে না, পয়সার ধান্দা থাকলেও হবে না। রুগি তোমার কথামতো ওষুধ খায় কিনা দেখতে হবে, পথ্য দেখতে হবে, রুগিকে আপনজনের মতো ভালবাসতে হবে। ভালবাসাই চিকিৎসার মূল কথা। স্নেহ, মমতা, দরদ না থাকলে ভাল চিকিৎসা হয় না। আরো আছে, কোন্ লক্ষণ দেখে কোন্ রুগিকে কী ওষুধ দিলে, আর তার ফলাফল কী হল, এসব লিখে রাখতে হয় আলাদা খাতায়। মাঝে-মাঝে খাতাখানা খুলে দেখতে হয়। তাতে কিছু ভুল হয় না। অতীতে যদি কোনো ভুল চিকিৎসা করে থাকে, তবে তা শুধরে নিতে পারবে, আর ভুল করবে না। আমার এরকম কুড়ি-একুশখানা খাতা আছে, সেগুলো ছেপে বই বার করলে মানুষের উপকার হবে। কিন্তু আমার আয়ুতে বোধহয় আর অত কাজ কুলোবে না। সেই খাতাগুলো তোমাকে সব দিয়ে যাব।"

বুরুনের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। দাদু এমনভাবে কথা বলছেন, যেন তাঁর আর বেশিদিন নয়।

একটু বেলায় দাদু চাকর সঙ্গে নিয়ে গোঁসাইবাগানের দিকে গাছপালার সন্ধানে গেলেন। বুরুন সেই ফাঁকে দাদুর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বুরুনের মন খারাপ থাকলেই সে গিয়ে দাদুর ঘর থেকে চুরি করে চ্যবনপ্রাশ খায়। দাদুর চ্যবনপ্রাশ একদম আচারের মতো খেতে।

ঘরের মধ্যে কবিরাজী ওষুধের একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ। এই ঝাঁঝালো সুন্দর গন্ধটা বুরুনের দারুণ ভাল লাগে। আর এই জন্যই তার মাঝে-মাঝে কবিরাজ হতে ইচ্ছে করে।

চ্যবনপ্রাশের বয়াম থেকে এক কোষ তুলে চাটতে চাটতে বুরুন গিয়ে দাদুর আরাম-কেদারায় বসে। আরাম-কেদারায় দাদুর মাথার তিল তেলের গন্ধ লেগে আছে। বেশ লাগে।

হঠাৎ একটু হাওয়া ছাড়ল। ঘরের মধ্যে দাদুর টেবিলের কিছু কাগজপত্র এদিক-ওদিক উড়ে গেল। আর একটা ছোট্ট কাগজ উড়ে এসে পড়ল বুরুনের কোলে।

অন্যমনস্ক বুরুন কাগজটা খুলে দেখে লাল কালিতে লেখা একটা চিঠি। চিঠির ভাষা এরকম: প্রণামান্তে নিবেদনমেতৎ যে মহাশয়, আমাদের পরম পূজনীয় সদার হাবু মহারাজকে জব্দ করিবার নিমিত্ত আপনি যে সব দুষ্কার্য ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। হাবু মহারাজ শীঘ্রই সরকারের হেফাজত হইতে খালাস পাইবেন। আমরা মা কালীর নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হাবু মহারাজের অপমানের প্রতিশোধ লইব। আপনার অন্তিম সময় আগত জানিবেন। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া দিন গুনিতেছি। নিবেদন ইতি— আপনার দাসানুদাস হাবু মহারাজের অনুচরবৃন্দ।

চিঠিটা পড়ে বুরুন অবাক। এত বিনয় আর নম্রতার সঙ্গে কেউ কাউকে শাসায় নাকি? তার ভারি হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ দাদুর সব হাবভাব আর কথাবার্তা মনে পড়ে যাওয়ায় সে বুঝতে পারল চিঠিটা মজার নয়। এলেবেলে চিঠি হলে দাদু অত অন্যরকম হয়ে যেতেন না।

চ্যবনপ্রাশটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে বুরুন নিজের ঘরে আসে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে গম্ভীর গলায় ডাকে, "নিধিরাম! ও নিধিদা!"

নিধিরাম কাছে-পিঠে না থাকলেও ক্ষতি নেই। চারদিকে বাতাসে, আনাচে-কানাচে নিধিরামের অসংখ্য চর ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে অনেক নতুন ভূত, আনাড়ি ভূত, ভিতু ভূত, গাড়োল ভূত, পাগল ভূত, সাধু আর চোর ভূত আছে। কিন্তু সকলকেই নিধিরামের বলা আছে যে, বুরুন তাকে ডাকলে তক্ষুনি যেন খবর দেওয়া হয়।

আজও একটা লিকলিকে রোগা ভূত মোটা ডিকশনারির পাতার মধ্যে ঢুকে চ্যাপটা হয়ে ঘুমোচ্ছিল। বুরুনের ডাক শুনে তড়াক করে যখন বেরিয়ে এল, তখনো তার শরীরটা কাগজের মতো চ্যাপটা হয়ে আছে। ঘুম-চোখে তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করে বলল, "আজ্ঞে উনি একটু মড়া আহার করতে মনসাগুড়ি গেছেন। সেখানে মড়ক লেগেছে কিনা।"

"মড়া আহার করতে? এঃ—" ঘেন্নায় বুরুন ঠোঁট বাঁকায়।

রোগা ভূত একগাল হেসে বলে, "যখন ভূত হবেন, তখন আর আপনি অমন কথা বলবেন না। সে এমন ভাল খেতে যে, পোলাও কালিয়া কোথায় লাগে!"

বুরুন বিরক্ত হয়ে বলে, "তাকে এক্ষুনি ডাকো। বলো, বিশেষ দরকার।"

লিকলিকে ভূতটা 'যাচ্ছি' বলে এক লফে আকাশ পার হয়ে গেল। একটু বাদেই নিধিরাম খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে হাজির।

"ডাকলে কেন?"

বুরুন বলল, "আঁচিয়ে এসেছ?"

"ভূতের আবার আঁচানো!"

"যাও, আঁচিয়ে এসো! স্বাস্থ্যবিধি মানো না, সদাচার নেই—তোমার কেমন মানুষ বলো তো নিধিদা?"

লজ্জা পেয়ে নিধিরাম আঁচিয়ে আসে।

বুরুন জিগ্যেস করে, "হাবু মহারাজ বলে কাউকে চেনো?"

নিধিরাম চমকে উঠে বলে, "ও বাবা! চিনব না? সে আমাদের কম জ্বালিয়েছে নাকি?"

"কী রকম?"

"ওঃ সে আর বোলো না। হাবু গুণ্ডা ভূতের মন্ত্র জানত। তাই দিয়ে আমাদের বশ করে করে খুব খাটাত। সর্ষে আর ঝাঁটা দিয়ে পেটাতও খুব। কেন বলো তো, তার কথা জিগ্যেস করছ?"

"সে যদি আবার এখানে আসে, তবে কী হবে?"

"আসবে? ও বাবা, তবে গেছি।"

"তোমরা ওকে খুব ভয় খাও নাকি?"

"তাকে, সবাই ভয় খায়। আমাদের যে কী নাকাল করত একসময়ে।"

বুরুন গম্ভীর হয়ে বলে, "আমি একটা কথা স্পষ্ট জানতে চাই। হাবু এখানে এলে তুমি তাকে বেশি খাতির করবে, না আমাকে?"

নিধিরামও গম্ভীর হয়ে বলে, "দেখ বুরুন, তুমি বাচ্চা ছেলে বলে নিতান্ত মায়ায় পড়ে তোমার কাজকর্ম করে দিই। খাতিরও দেখাই। কিন্তু হাবুর হল অন্য কথা। তাকে আমরা কেউ ভালবাসি না বটে, দু'চক্ষে দেখতেও পারি না, কিন্তু তার হল মন্ত্রের জোর। মন্ত্রের কাছে তো আর চালাকি চলে না। সে ঘাড় ধরে আমাদের দিয়ে চাকরবাকরের কাজ করিয়ে নেবে। তাই সে যদি আসে, তবে সাফ বলে দিচ্ছি যে, আমাদের আর তোমার পক্ষ নেওয়া সম্ভব হবে না।"

"বটে?"

"হ্যাঁ। কী করব বলো, আমরা মন্ত্রের বশ।"

বুরুন খুব চিন্তিত হয়ে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "তখন ডাকলেও আসবে না?"

নিধিরাম মাথা নেড়ে বলে, "আসব না বলছি না। তবে সে সময়ে যদি হাবু কোনো কাজে লাগিয়ে দেয়, তবে আসা সম্ভব নয়। আগে হাবুর কাজ তারপর অন্য কথা।"

"হাবু যদি তোমাকে হুকুম করে—যাও গিয়ে বুরুনের মাথাটা ছিঁড়ে আনো, তাহলে আমার মাথা সত্যিই ছিঁড়ে নেবে?"

নিধিরাম যদিও ভূত, তবু এখন তারও কপালে ঘাম দেখা দিল। অস্বস্তির সঙ্গে বলল, "ওসব অলুক্ষণে কথা থাক। বলতে নেই।"

"যদি হাবু অমন কথা বলেই তবে কী করবে?"

নিধিরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি বুরুন, কী আর বলব! তবে হাবুর যদি হুকুম হয়, তবে নিজের মাথা ছিঁড়তেও আমরা বাধ্য।"

দোলের দিনটা এগিয়ে এল যেন ঘোড়ায় চেপে।

হাবু গুণ্ডা যে ছাড়া পাবে, সে-খবর পাঁচকান হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কারো আর জানতে বাকি নেই।

হাবু যত পাজিই হোক, এ শহরে কিছু লোক আছে যারা হাবুর পরম ভক্ত। তারা মনে করে—হাবুর যে সব অলৌকিক শক্তি দেখা গেছে, সেরকমটা শুধু বড়-বড় মহাপুরুষদের থাকে। কাজেই হাবু চুরি-ডাকাতি যাই করুক, এসব লোকদের কাছে সে সাক্ষাৎ ভগবানের ছোট ভাই।

এইরকমই একজন হল পাঁচকড়ি আঢ্য। একসময়ে সে 'হাবু ওস্তাদের পাঁচালি' নামে একখানা চটি-বইও বের করেছিল। তাতে ছিল, "প্রথমে বন্দনা করি দেব মহেশ্বর। তার পরেতে বন্দি আমি সর্ব চরাচর॥ বড় সুখে পূজি আমি বাগ্‌দেবীর চরণ। মাতাপিতার চরণে দেই সর্ব প্রাণমন॥ উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণেতে বন। তার মধ্যে কত গ্রাম গঞ্জ অগণন॥ গঞ্জের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ভ্যাটাগুড়ি ধাম। যেথায় বসতি করেন হাবু পুণ্যবান॥"

এরপর পাঁচালিতে পাঁচকড়ি আরও লিখেছিল, "গুণাকর হাবুর গুণের নাই শেষ। পলকে মনুষ্যে ধরি করি দেয় মেষ॥ ব্যাঘ্র বাহন আর ভূতপ্রেতের সঙ্গ। নিশি দারোগা ভাগে রণে দিয়া ভঙ্গ। অয়স্কান্ত বীরত্ব দেখাতে এসেছিল। হাবু ওস্তাদ কৌশলে তারেও তাড়াইল॥ অবশেষে হেলেদুলে আসিল গদাই। গুণাকরের কোপে শেষে তারও রক্ষা নাই॥"

একসময়ে এই পাঁচালি হাটে-বাজারে বয়ে ফিরত পাঁচকড়ি। গদাই দারোগার হাতে হাবু জব্দ হওয়ার পর সে কিছু মিইয়ে যায়।

বহুদিন বাদে আবার হাবু ফিরে আসছে শুনে তার একগাল হাসি দেখা গেল। রাম কবিরাজের সঙ্গে একদিন দেখা করে বলল, "কবরেজমশাই, শুনেছেন নাকি! হাবু দেবতা আবার ফিরে আসছেন। যারা তাঁকে হাজতে পাঠিয়েছিল, এবার তারা ঠ্যালা বুঝবে, কী বলেন ঠাকুর?"

রাম কবিরাজের সঙ্গে হাবু কী জানি কেন কোনোদিন তেমন ঝামেলা করেনি। কিন্তু কবিরাজমশাই নিজে গিয়ে যখন হাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, তখন হাবু আদালতেই বলে উঠেছিল, "কাজটা ভাল করলেন না রামদা।"

কথাটা কবিরাজমশাইয়ের মনে আছে। তিনি তেতো মুখ করে পাঁচকড়িকে বললেন, "মানুষকে খামোকা দেবতা বানাচ্ছ কেন? হাবু আর যাই হোক, মানুষই বটে।"

পাঁচকড়ি জিভ কেটে বলে, "ছি ছি, ওকথা বললে পাপ হয়। তাঁর ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানের মতো।"

"তাই যদি হবে তো জেল থেকে বেরোতে পারল না কেন মন্ত্রের গুণে?"

“সে তার লীলা। আমি একবার হাজতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে কী দেখলাম জানেন? তাঁর কপালে সিঁদুরের ত্রিশূল, অ্যাই বড় জটা হয়েছে চুলে, চোখ রক্তবর্ণ। আর সেপাই থেকে শুরু করে জেলার সাহেব পর্যন্ত দিনরাত তাঁর সামনে হাত জোড় করে আছেন। শয়ে-শয়ে লোক এসে তাঁর ভোগের জন্য মণ্ডা মেঠাই, তরিতরকারি, মাছ-মাংস দিয়ে যায়। জেলের সবাই তাঁর প্রসাদ পায়। আমাকে বললেন, ‘ওরে পাঁচকড়ি, হাজতে ক'দিন থেকে একটু চিত্তশুদ্ধি করছি।”

“ভগবানেরও তাহলে চিত্তশুদ্ধির দরকার হয় বলছ?”

পাঁচকড়ি রেগে গিয়ে বলে, “অবিশ্বাস করছেন? এই বলে রাখছি কবিরাজমশাই, আপনারা কেউ নিস্তার পাবেন না।”

পাঁচকড়ি বিদায় হলে রাম কবিরাজ নিজের মনে খানিক চিন্তা করলেন। তারপর বোধহয় থানামুখো রওনা দিলেন।

থানায় নতুন দারোগা এসেছে। অল্পবয়সী ছোকরা, কথায়-কথায় ফটাফট ইংরিজি বলে ফেলে। ছোকরা খুব একটা খারাপ মানুষ নয়, তবে কিনা কাজেকর্মে এখনো তেমন পোক্ত হয়ে ওঠেনি।

কবিরাজমশাই হাবুর কথা তুলতেই ছোকরা দারোগা শম্ভুচরণ বলে ওঠে, “ওঃ, দ্যাট ফেমাস রোগ? না, এবার আর তার কোনো জারিজুরি খাটবে না।”

রাম কবিরাজ হেসে বললেন, “তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা, করে দেবে ঠাণ্ডা? না হে বাপু, কাজটা অত সহজ নয়।”

বাবুরাম সাপুড়ের সেই কবিতা বোধহয় শম্ভুচরণ পড়েনি। যাই হোক, সে একটু ডাঁটের সঙ্গে বলল, “নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন গে কবিরাজমশাই, হাবুকে কাবু করতে আমার দু'দিনও লাগবে না। অবশ্য সে যদি গোলমাল করে।”

দোলের কয়েক দিন আগে গঞ্জে কিছু কিছু সন্দেহজনক চেহারার লোকের আনাগোনা হতে লাগল। তারা আড়ে আড়ে চায়, গোমড়ামুখ করে ঘোরে ফেরে, কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না।

হরিহরবাবু সাইকেলে চেপে তিস্তাঘাটে গিয়েছিলেন। সন্ধের মুখে ফিরবার সময় গঞ্জের উত্তর দিকের শাল-জঙ্গলের মধ্যে বাতাস শুঁকে বাঘের গন্ধ পেলেন। এত জোরে সাইকেল চালিয়েছিলেন যে, দু'-চাকার গাড়িখানা শেষমেশ চাকায় ভর দেওয়া ছেড়ে যেন পাখনায় ভর করল। বাজারের কাছে এসে “বাঃ...বাঃ” বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন সাইকেলসুদ্ধ।

লোকজন ভিড় করে এল। একজন বলতে লাগল, “উনি ‘বাঃ বাঃ’ বলে কাকে যেন বাহবা দিচ্ছিলেন এইমাত্র। তবে পড়লেন কেন?”

অন্যজন বলল, “উনি এত জোরে সাইকেল চালিয়েছিলেন যে, নিজের এলেম দেখে নিজেকে নিজেই বাহবা দিচ্ছিলেন।”

একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে জিগ্যেস করল, “সাইকেলটাও কি অজ্ঞান হয়ে গেছে বাবা?”

সনাতনবাবুর বড় দাবার নেশা, সারাদিন দাবাড়ু খুঁজে বেড়ান। তা, গঞ্জে ভাল দাবাড় আর ক'জনই বা আছে? যারা আছে, তাদেরও তো সব সময়ে পাওয়া যায় না। সনাতনবাবু আবার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে উঠে হ্যারিকেন উসকে দাবার ছক পেতে বসেন। তখন সঙ্গীসাথী আর পাবেন কোথায়, তাই একা একাই ঘুঁটি সাজিয়ে দু' দিকেই চাল দেন। এরকম এক রাতে খেলতে বসেছেন। হঠাৎ দেখেন, তাঁর উল্টো দিকের ঘুঁটি

আপনা থেকেই চলছে। আর কী অসাধারণ সব চাল! খেলা শুরু হতে না হতেই বারো চালের মাথায় ঘোড়া আর গজের মুখে মাত হয়ে গেলেন। খেলা যখন চলছিল, তখন দাবার নেশায় অত খেয়াল করেননি। খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ "বাপরে" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ভয়ে তাঁর দাঁত-কপাটি লাগল।

তবে একথা ঠিক যে, গঞ্জে বাঘের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল এবং অলৌকিক সব কাণ্ডও ঘটতে শুরু করেছিল।

রাম কবিরাজের দোকানে সবাই খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছেন সন্ধেবেলায়।

কমলাক্ষবাবু কম্ফর্টার জড়িয়ে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে হাজির হয়ে বললেন, "আর বোলো না। দামি শালটা —"

"শালটা কী হল?" রামবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করেন।

"নিয়ে গেল।"

"কে?"

"আর কে!"

সবাই মুখের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু কমলাক্ষবাবু এর বেশি বলতে রাজী হলেন না।

রাম কবিরাজ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "নিয়তি কে ন বধ্যতে।"

মন্মথবাবুও সেই কথায় সায় দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, "সেকথা ঠিক। আমরা যতই না কেন সাবধান হই, নিয়তি মারলে কিছু করার নেই।"

রামবাবু কটমট করে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "আমি আমাদের কথা বলিনি। আমাদের নিয়তি ঠিক আছে। আমি হাবু গুণ্ডার নিয়তিটাই দেখছি।"

মন্মথবাবু চারপাশ চোরা চোখে দেখে নিয়ে বললেন, "ও নাম মুখে এনো না। কে কোথায় শুনতে পাবে।"

কমলাক্ষবাবুও বললেন, "কবরেজ, তোমার সাহসটা একটু কমাও। সাহস ভাল, কিন্তু অতি সাহস ভাল নয়।"

সা-রা-রা-রা ঢেক চলি যা ঢেক চলি যা ঢেক চলি যা...। সারারাত দেহাতীদের বস্তিতে দোলের সঙ্গে গান হয়েছে। ভোর হলেই দোল।

ছেলেমেয়েরা পিচকিরি রঙ, আবির সব দু'-তিন দিন আগে থেকে জোগাড় করে রেখেছে। রং খেলার জন্য যার যা ছেঁড়া পুরনো জামাকাপড় আছে, তা বের করা হয়েছে বাক্স-প্যাঁটরা ঘেঁটে। পচা ডিম জোগাড় করা, বেলুন-বোম তৈরি করা শেষ। আলু আধখানা করে কেটে তাতে ব্লেড দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে উল্টো করে "গাধা" লেখা হয়ে গেছে অনেকেরই। দু'-চারজন বড়লোকের বাড়িতে আবার দোলের দিন রং দিতে গেলে খাওয়ায়। এবার কে কী খাওয়াবে তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে।

মন্মথবাবুর নাতি ভুতুম মহা ডানপিটে দুষ্ট ছেলে। সে তার আবিরের মধ্যে চুপি চুপি লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে রেখেছে। ডিমের খোলা জোগাড় করে তার মধ্যে ডেঁও আর লাল পেটওয়ালা কাঠপিঁপড়ে ধরে এনে ভরেছে। তারপর আটা গুলে ডিমের খোলা জুড়ে নিয়েছে। যার গায়ে ছুঁড়বে তার গায়ে রং লাগবে না বটে, কিন্তু পিঁপড়ের কামড়ে তিড়িং তিড়িং লাফাবে। তা ছাড়া তার রঙের বালতিতে কাঁচা গোবর মেশানো আছে, আর আছে আলকাতরার কৌটো।

ভুতুমের সঙ্গে রং খেলা দূরে থাকুক, এমনিতেই কেউ খেলতে চায় না। তার মতো দুষ্টু ছেলে গঞ্জে নেই। শুধু পরান নামে একটি ছেলে আছে, যে ভুতুমের মতো অতটা না হলেও বেশ দুষ্টু। সেই পরান হল ভুতুমের প্রাণের বন্ধু। ভুতুম কিন্তু পরানকেও ছাড়ে না। একবার তার জামার পকেটে শুয়োপোকা ছেড়ে দিয়েছিল।

বুরুনের এবার রং খেলা বারণ ছিল। তার বাবা বলে দিয়েছেন, "সামনের বছর অল সাবজেক্টে ভালভাবে পাশ করলে আর অঙ্কে লেটার পেলে আবার নরম্যাল লাইফ ফিরে পাবে।"

বুরুনের বাবা ইস্কুলে প্রায়ই খোঁজখবর ক'রে বুরুনের কতটা উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে তা জেনে নেন। মাস্টারমশাইরা একবাক্যে বলেন, বুরুনের উন্নতি অসাধারণ। সে শুধু ফাইনালে ফার্স্টই হবে না, আরো অনেক কিছু করবে। যেমন, অলিম্পিক থেকে অন্তত বারোটা সোনার মেডেল আনবে, ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙবে, ফুটবলে গোষ্ঠ পালকে ছাড়াবে।

বুরুনের বাবা এসব কথায় তেমন গুরুত্ব দেন না। তবে শুনে একটু-আধটু খুশি যে না হন, তা নয়। কিন্তু খুশি হয়ে রাশ আলগা করেন না। ছেলেকে কড়া শৃঙ্খলায় রাখেন।

দোলের দিন সকাল হতে-না-হতেই রাস্তা থেকে ছেলেদের হল্লা ভেসে আসছিল। ছেলেরা রং নিয়ে একে-ওকে তাড়া করছে। খুব হাসছে। চেঁচাচ্ছে।

বুরুন তখন নিজের পড়ার ঘরটিতে বসে দাঁতে দাঁত চেপে অঙ্ক কষে যাচ্ছে। আজকাল দিনে গড়পড়তায় কুড়িটা করে কঙ্ক কষতে হয়। করালীবাবুর দেওয়া বোমার মতো অঙ্ক সব। দাঁত বসানোই শক্ত। পরশু পর্যন্ত এসব অঙ্ক জলের মতো সহজে করে ফেলেছে বুরুন। না, ঠিক বুরুন করেনি—বুরুনের হাত দিয়ে সেগুলো কষে দিয়েছে আসলে নিধিরাম। কিন্তু কাল থেকে নিধিরামের পাত্তা নেই। এমন কী, যে সব নতুন শিক্ষার্থী ভূত নিধিরামের দূত হয়ে আশেপাশে থাকত, তাদেরও কারো টিকি দেখা যাচ্ছে না। অনেক ডাকাডাকিতে কাল দুপুরবেলা কয়েক মুহূর্তের জন্য নিধিরাম এসেছিল। তার সারা গায়ে মাটি মাথা, চোখ দুটো করুণ, ঘাম হচ্ছে খুব। বলল, "আর বোলো না, গোঁসাইবাগানের জঙ্গল সাফ করছি, হাবু ওস্তাদ এসে গেছেন কিনা। এসেই হুকুমের পর হুকুম চালাচ্ছেন। কাজ কি সোজা! বিছুটি-বন কাটতে হলে বুঝতে পারতে।"

বুরুন কান্না-কান্না মুখ করে বলে, "তুমি না থাকলে আমার অঙ্ক কি ট্রানস্লেশন কে করে দেবে বলো তো নিধিদা?"

নিধিরাম গম্ভীর হয়ে বলে, "দ্যাখো বুরুন, যা করেছি তা করেছি। এখন ওসব ভুলে যাও। আমাকে আর বড় একটা পাবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো এবার।"

বুরুন তখন লোভ দেখিয়ে বলে, "আমি ঠিক তোমাকে ভয় খাব এবার থেকে, দেখো।"

নিধি হেসে বলে, "এখন আর ভয় দেখানোর সময় নেই যে। স্বয়ং গোঁসাইবাবা পর্যন্ত হাবুর ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন। দম ফেলার ফুরসত নেই। তুমি আর কতটুকুই বা ভয় খাবে? আমরা হাবুকে যা ভয় খাচ্ছি, সে আর বলার নয়।"

বুরুন বলল, "হাবু হুকুম দিলে সব কিছু করতে পারো, নিধিদা?"

নিধিরাম হেসে বলে, "সব কি পারি রে ভাই? আমাদের হল গিয়ে হাওয়া-বাতাসের শরীর। তা সেই হাওয়া-বাতাসের জোর দিয়ে যা করা যায় সেসব পারি।"

বুরুন বলে, "আমার দাদু রাম কবিরাজের ঘাড় যদি মটকাতে বলে হাবু, মটকাবে?"

নিধি কবিরাজমশাইয়ের নাম শুনেই সাঁত করে মিলিয়ে গেল বাতাসে। বুরুন অবাক। পরে ভেবেচিন্তে দেখল, নিধিরামের সামনে দাদুর নামটা উচ্চারণ করা ঠিক হয়নি। 'রাম' নামকে কোনো ভূত সহ্য করতে পারে?

সেই যে গেছে নিধিরাম, অনেক ডাকাডাকিতেও আর আসেনি। তাই কাল থেকে বুরুনকে তার অঙ্ক ট্রানস্লেশন সব নিজেকেই করতে হচ্ছে। কাল করালীবাবুর বাড়িতে পড়তে গিয়ে বুরুন খুব বিপদে পড়েছিল। করালীবাবু যা-ই জিগ্যেস করেন, তা-ই বলতে না পেরে বুরুন হাঁ করে থাকে। কালীবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "সে কী বুরুন? আমি যে ভেবেছিলাম, তুমি আইনস্টাইনের মতো একজন কেওকেটা হবে! কালও তো তুমি সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক সব অঙ্ককে ঘায়েল করে গেছ!"

কাল ইস্কুলে ট্রানস্লেশনও পারেনি বুরুন, ভূগোল ক্লাসে ভুল করেছে। ছুটির পর খেলতে গিয়ে শূন্য রানে আউট হয়েছে, বলও করেছে যাচ্ছেতাই। তার অবনতি দেখে গেম টিচার পর্যন্ত অবাক।

আজ তাই বুরুনের বড় মন খারাপ। পড়ার টেবিলের সামনেই জানালা। সেটা দিয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখা যায়। একটাও অঙ্ক না মেলাতে পেরে বুরুন খুব অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। আজ দোল। সবাই রং খেলছে। সে খেলবে না। তার ওপর নিধিরাম ছেড়ে গেছে তাকে। হাবু গুণ্ডা এসেছে দাদুকে জব্দ করতে।

কত কী ভাবছিল বুরুন। ঠিক এসময়ে জানালা দিয়ে একটা রঙ-মাখা মুখ উঁকি দিল। বুরুন সাবধান হওয়ার আগেই একমুঠো ঝাল আবির উড়ে এল তার চোখেমুখে। অঙ্কের বই-খাতা ভাসিয়ে গোবর-গোলা ম্যাজেন্টা রঙ ছড়িয়ে পড়ল। আর ডেঁও আর কাঠপিঁপড়ে বোঝাই একটা ফাঁপা ডিমের খোলা তার কপালে লেগে ভেঙে গিয়ে পিঁপড়ে বাইতে লাগল সর্বাঙ্গে!

লঙ্কার জ্বলুনি আর পিঁপড়ের কামড়ে মুহূর্তের মধ্যে বুরুন তিড়িং তিড়িং লাফাতে থাকে। রাগে তার পিত্তি জ্বলে যায়। "নিধিদা, নিধিদা" বলে বারকয়েক ডেকে খেয়াল করে যে, নিধিরাম হাবুর বেগার খাটছে, আসবে না। তখন ভুতুমকে ধরার জন্য বুরুন দুই লাফে ঘর থেকে রাস্তায় পড়ল।

ভুতুম দৌড়ে পালাচ্ছে। বুরুন তাকে ধাওয়া করতে-করতে ভাবে, কতক্ষণ দৌড়বে। এই ধরলাম বলে।

কিন্তু স্পোর্টসে সে যেরকম বিশ্বরেকর্ড-ভাঙা দৌড় দৌড়েছিল, এখন তার দৌড়ের বহর সেরকম তো নয়ই, উপরন্তু ভুতুমকে ধরতে খানিক দৌড়ে সে হাঁফিয়েও উঠল। রাস্তার ছেলেমেয়েরা খুব চেঁচিয়ে বুরুনকে সাবাশ দিচ্ছিল। তারা ভাবছিল গঞ্জের চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টসম্যান, যে কিনা একদিন অলিম্পিক থেকে একাই এক ডজন সোনার মেডেল আনবে বলে সবাই জানে, এক্ষুনি ভুতুমকে ধরে ফেলবে।

কিন্তু আজ মোটেই তা হল না। ভুতুম অনায়াসে দৌড়ে অনেক দূর চলে গিয়ে পিছু ফিরে দু' হাতে কাঁচকলা দেখাতে লাগল বুরুনকে। মুখে হি-হি হাসি।

গোমড়ামুখে বুরুন ফেরত আসছিল, কিন্তু মাঝপথে একপাল ছেলে তাকে ধরে আচ্ছাসে রঙ মাখায়। বুরুন গায়ের জোর খাটিয়ে সব ক'টাকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখল যে, সে একটাকেই কায়দা করতে পারছে না। অথচ পরশুদিন পর্যন্ত তার গায়ে সাতটা হাতির জোর ছিল, কোনো ছেলে লাগতে সাহস পেত না।

রঙ-মাখা বুরুন অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আর এক পাল ছেলে এসে পিচকারিতে তাকে ভিজিয়ে দেয়। পচা ডিম ছুঁড়ে দেয় কে যেন। তাই বুরুন আর বাড়ি ফিরল না। ছেলের দলের সঙ্গে মিশে পাড়ায়-পাড়ায় রঙ খেলতে বেরিয়ে পড়ল।

আবির দিয়ে দোলখেলা শুরু হয়েছিল। সেইসঙ্গে গোলা রঙ। শেষে আলকাতরা, কাদা আর গোবর। রঙে-রঙে ভূত হয়ে যেতে লাগল সবাই। শেষে এমন অবস্থা হল যে, কে কোন্ লোক তা আর চিনবার জো রইল না। রাস্তাঘাটে সবাই সঙ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাউকেই চেনা যাচ্ছে না।

বুরুন রঙ-মাখা ছেলেদের মধ্যে ভুতুমকে খুঁজছিল। আর কিছুর জন্য নয়, ভুতুমকে পেলে তার কানদুটো আচ্ছাসে মলে দিয়ে মাথায় দুটো চাঁটি দেবে। বড্ড বেয়াড়া হয়েছে ছেলেটা।

অনেক খুঁজে বকুলতলার কাছে ভুতুমকে দেখতে পেল বুরুন। নর্দমার পাঁক তুলে রাস্তার লোকের গায়ে ছুঁড়ছে। বুরুন গিয়ে তাঁর একটা কান পাকড়ে মাথায় একটা রাম চাঁটি দিয়ে বলে, "খুব যে সকালে লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া আবির দিয়েছিলি! এখন?"

ভুতুম ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠে বলে, "দাঁড়াও দাদাকে ডেকে আনছি। কালও তুমি চাঁটি দিয়েছিলে বিশুদা, আর মার্বেল কেড়ে নিয়েছিলে..."

বুরুন ভুল বুঝতে পেরে জিভ কাটে। ভুতুম নয়, ক্লাস ফোরের ছিঁচকাঁদুনে ফুচু। অবশ্য ফুচুও তাকে চিনতে পারেনি, বিশু বলে ভুল করেছে। বুরুন তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

কুমোরপাড়ায় অবশেষে বুরুন ভুতুমকে পেয়ে যায়। রঙের বালতিতে কেরোসিন মেশাচ্ছে। বুরুন গিয়ে তাকে হাত চেপে ধরে বলে "ভুতুম! এবার কোথায় পালাবি? সকালে যে বড়—"

ভুতুম অবাক হয়ে চেয়ে বলে, "দ্যাখ মোনা, ফের ইয়ার্কি করবি তো সেদিনের মতো গুলতি মারব। আমাদের পাড়ার ছেলেকে ল্যাং মেরে মার খেয়েছিলি সেদিন, তবু লজ্জা নেই?"

বলে ভুল-ভুতুম টক করে প্যান্টের পকেট থেকে গুলতি বের করতেই বুরুন ভোঁ-দৌড়। পিছন থেকে একটা ছুটন্ত গুড়ুল তার পিঠের হাড়ে ঠং করে এসে লাগল। আগে হলে নিধিদা ঠিক গুড়ুলটা অন্য দিকে উড়িয়ে দিত। কিন্তু নিধিরাম তো এখন আর নেই।

ভুতুমকে খুঁজতে গিয়ে বারকয়েক এরকমভাবে ভুল-ভুতুমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বুরুনের। অবশ্য তারাও কেউ বুরুনকে চিনতে পারেনি।

খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান হয়ে বুরুন রথতলায় একটা জামগাছের নীচে শান্তশিষ্ট একটি ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ভারি শান্তভাবে রঙিন ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কোনো পিচকিরি না খারাপ রঙ নেই। শুধু একটু আবির। বুরুন তাকে গিয়ে জিগ্যেস করল, "হ্যাঁ খোকা, নোয়াপাড়ার ভুতুমকে এদিকে কোথাও দেখেছ?'

ছেলেটা হাসি-হাসি মুখ করতেই তার দাঁতে লাল নীল রঙ দেখা গেল। ছেলেটা খুব ভাল গলায় বলে, "হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু তুমি কে বলো তো?"

"আমি বুরুন।"

"ও, চ্যাম্পিয়ন? তুমি হলে শহরের গৌরব। আমাদের বাসায় তোমাকে নিয়ে খুব আলোচনা হয়। এসো, তোমাকে একটু আবির দিই! দেব তো? মনে কিছু করবে না তো?"

ছেলেটার এরকম ভদ্র আর সুন্দর ব্যবহারে বুরুন মুগ্ধ হয়ে গিয়ে বললে, "কেন আবির নষ্ট করবে ভাই? আমার গায়ে আর রঙ দেওয়ার জায়গাই নেই যে।"

ছেলেটা করুণ স্বরে বলে, "কিন্তু ছুটে কারো সঙ্গে পারি না বলে আজ যে আমি কারো গায়ে রঙ দিতে পারিনি!"

বড় মায়া হল শুনে, তাই বুরুন মুখটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "তাহলে দাও।"

ছেলেটা হুশ করে হাতের আবির বুরুনের মুখে ছুঁড়ে দিয়েই দৌড়। আর লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো ঝাল আবিরে বুরুনের চোখ-মুখ জিভ জ্বলে যেতে লাগল। ছেলেটা দৌড়তে দৌড়তেই চেঁচিয়ে বলল, "দুয়ো! দুয়ো! আমিই ভুতুম। ধরতে পারলে না!"

রাগে বুরুনের মাথার ঠিক রইল না। সে চোখ মুছতে মুছতেই শব্দ লক্ষ করে ভুতুমকে ধাওয়া করে যেতে লাগল। পায়ের শব্দে আর গলার স্বরে বুঝতে পারল যে, ভুতুম যাচ্ছে গোঁসাইবাগানের দিকে। শহরের সবচেয়ে ভাল পুকুরটা ওই দিকেই। গোঁসাইবাগানের কাছে বিশাল পুকুরটাকে লোকে বলে সমুদ্রদিঘি। সারা বছর টলটলে জলে ভরা থাকে। ওরকম ভাল জল আর কোথাও নেই। কিন্তু অনেকটা দূরে বলে আর ভয়ের জায়গা বলে লোকে সেখানে বড় একটা স্নান করতে যায় না।

বুরুন পরিষ্কার শুনতে পেল ভুতুম দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রদিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে চেঁচাল, "দুয়ো! ধরতে পারল না!"

বুরুনও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়ে দিঘিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জলে কিছুক্ষণ নাকানি-চোবানি খাওয়ার পর চোখ পরিষ্কার হয়ে আসে। তখন চারদিকে চেয়ে সে ভুতুমকে খোঁজে।

কিন্তু পুকুরে জনপ্রাণী নেই। চারিদিকে ঠাণ্ডা নিস্তরঙ্গ জল। কোথাও একটা ভুরভুরিও দেখা যায় না। তবে দিঘিটা এত বিশাল যে, সবটা নজর করা মুশকিল। বদমাশ ভুতুম নিশ্চয়ই ডুব-সাঁতার দিয়ে কোথাও ভেসে উঠবে ভেবে বুরুন অনেকক্ষণ জলে সাঁতরে বেড়াল। কিন্তু ভুতুম কোথাও ভেসে উঠল না। ডুবে গেল নাকি ছেলেটা? কিন্তু ডোববার ছেলে তো ভুতুম নয়! চৌপর দিন সে তার বাড়ির পাশের পুকুরটায় পড়ে থাকে। চিত, ডুব, কাত—কোনো সাঁতারই তার অজানা নয়। দমও আছে অনেক। তবে ভুতুমের হল কী?

খোঁজাখুঁজি করতে-করতে বুরুন দক্ষিণের ভাঙা ঘাটের কাছে চলে এল। ডুবে-ডুবে পা দিয়ে দিঘির তলায় খুঁজতে লাগল। যদি ভুতুম ডুবে গিয়ে থাকে, তবে ওর শরীরটা তো থাকবে নীচে।

হঠাৎ ঘাটের ওপর থেকে একটা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন এল, "তুমি ওখানে কী করছ?"

বুরুন অবাক হয়ে চেয়ে দেখে জটাওয়ালা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল চেহারা, গায়ে টকটকে লাল রঙের চাদর আর কাপড়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মুখে রাজ্যের দাড়িগোঁফ।

বুরুন ঘাটের একটা ডুবো-সিঁড়িতে গলা-জলে দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করে বলে, "একটা ছেলে বোধহয় জলে ডুবে গেছে, তাই খুঁজছি।"

লোকটা কোনো সাধুটাধু হবে, গম্ভীর গলায় বলল, "এ দিঘির জলে মায়ের পুজো হয়, তাই কারো নামা বারণ, তুমি উঠে এসো।"

বুরুন একটু ভয় খেয়েছিল। আস্তে-আস্তে জল থেকে উঠে ঘাটে দাঁড়াতেই লোকটা ফের জিগ্যেস করল, "তুমি কে?"

বুরুন ভেজা গায়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, “আমি বুরুন, ভেলু ডাক্তারের ছেলে, রাম কবিরাজ আমার দাদু।”

শুনে লোকটার মুখ একেবারে পাকা আমের মতো মিষ্টি হয়ে গেল। হেসে বলল, “তাই বলো! এসো এসো, আজ দোলের দিন তোমাকে মিষ্টিমুখ করাব। তোমার বাবা আর দাদুর সঙ্গে আমার খুব খাতির কিনা। এসো এসো।”

এই বলে লোকটা নিজেই এগিয়ে এসে বুরুনকে নড়া ধরে তুলে নিল। বুরুন টের পেল, লোকটার গায়ে অসুরের মতো জোর।

গোঁসাইবাগানের ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু রাস্তা। দিনের বেলাতেও আলো নেই। কেমন আবছা ভুতুড়ে ছায়া চারিদিকে। সেই রাস্তা দিয়ে লোকটা বুরুনের হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বুরুনের ভাল লাগছে না। সে বলল, “আপনি কে?”

“আমি!” হা হা করে হেসে লোকটা বলে, “আমি একজন সাধু মানুষ। ভয় পেও না। একসময়ে এই গঞ্জে সবাই আমাকে ‘হাবু ওস্তাদ’ নামে চিনত। এখনো কেউ কেউ চেনে। তোমার দাদু আর বাবা তো খুব চিনবে।”

বুরুন যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে কেঁপে উঠল। এই তবে হাবু ওস্তাদ!

গোঁসাইবাগানের পোড়ো বাড়ির চারপাশের জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে পাঁচ-সাতজন ষণ্ডা চেহারার লোক শুয়ে বসে আছে। তাদের চোখ রক্তবর্ণ, আর মাঝে-মাঝে “শিব স্বয়ম্ভু” বলে বিকট গলায় তারা হাঁক পাড়ছে। হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে “ঘ-ড়-ড়-ড়-ড়া-ম” করে কাছেই একটা বাঘ ডেকে উঠল। এত বিকট ডাক বুরুন জীবনে শোনেনি।

সে কেঁপে উঠতেই হাবু ওস্তাদ বলে, “ভয় নেই। ও আমার পোষা বাঘ। এত দিন জঙ্গলে ছিল, আমি ফিরে এসেছি খবর পেয়ে বাঘটাও ফিরে এসেছে।”

এত ভয় বুরুন জীবনে পায়নি। কাঁপা গলায় সে বলে, “আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাব।”

হাবু হেসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, “যাবে যাবে! তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ করাই, জায়গাটা একটু ঘুরেটুরে দেখ। হয়তো এ জায়গা তোমার এত ভাল লেগে যাবে যে, আর নিজের বাড়িতে ফিরতেই ইচ্ছে করবে না।”

বুরুন হাবুর হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, “না না। আমি বাড়ি যাব।”

হঠাৎ হাবু তার চোখে হাত বুলিয়ে দিয়ে খুব আলতো গলায় বলল, “এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে কোথায় যাবে?”

বুরুন চোখে হাত বোলাবার সময় চোখ বন্ধ করে ছিল। চোখ চাইতেই সে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

কোথায় সেই পোড়ো বাড়ি? কোথায়ই বা সেই জঙ্গল? সে দেখতে পেল, কী সুন্দর বাগান! অজস্র, অসংখ্য ফুল ফুটে আছে, সুগন্ধে ম-ম করছে চারধার। গাছে-গাছে দোয়েল শ্যামা কোকিল ডাকছে। ফুলে-ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট্ট প্রজাপতির মতো পরী। একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে তরতর করে। বাঁধানো ঘাটে একটা রঙিন নৌকো বাঁধা। সব কিছুই খুব ছোট-ছোট, খেলাঘরের মতো। কিন্তু ভারি সুন্দর। এখানে আকাশের রঙ সবুজ। রঙের বাক্সে যত রকম রঙ দেখা যায়, তত রকম রঙের ছোট বড় গোল চৌকো আর নানান আকৃতির মেঘ আকাশে ভাসছে। কোনো কোনো মেঘ খুব নিচু হয়ে প্রায় মাথা ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। মেঘগুলোর ওপরে চমৎকার

ছোট ছোট বসবার গদি রয়েছে। একটা মেঘ তার কাছে এসে বলে উঠল, "চড়বে নাকি বুরুন? চলো তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বুরুন উঠে পড়ল মেঘের কোলে। সাবানের ফেনার মতো নরম গদিতে বসে আস্তে আস্তে ওপরে উঠল। খুব ওপরে নয়, খুব বেশি হলে তিন তলার ছাদের সমান উঁচু হয়ে আস্তে আস্তে মেঘটা তাকে নিয়ে চলে।

অল্প দূরেই একটা ছোট পাহাড়, তার চূড়ায় বরফ জমে আছে। পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডুবছে। কী আশ্চর্য! এই সূর্যের চেহারা অবিকল আহ্লাদী মানুষের মুখের মতো। তার ঠোঁট, নাক, কান, চোখ সব আছে। বুরুনকে দেখে সূর্য বলে উঠল, "তোমার হুকুম পেলেই আমি উঠব বা ডুবব।"

বুরুন অবাক হয়ে দেখল। তারপর বলল, "তুমি একটু থাকো, আমি সব দেখে নিই ভাল করে। তারপর ডুবো।"

মেঘটা বলে উঠল, "সূর্য ডুবলেও এখানে কখনো অন্ধকার হয় না। চাঁদমামা আছে, তারা আছে, স্বপ্নের আলো আছে।"

একটা ছোট্ট রেল স্টেশনের ধারে তাকে নামিয়ে দিল মেঘ। স্টেশনের ঘরটা নানা রঙে রঙিন, প্ল্যাটফর্মে হলুদ মোরাম! ছোট বাতিদানে সবুজ-লাল-নীল আলো জ্বলছে। খুদে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে শ্বাস টানছে। কামরার জানালায় অদ্ভুত মজার মজার সব মুখ দেখে বুরুন। একটা জানালায় ডোনাল্ড ডাককে দেখতে পায়, অন্য জানালায় টিনটিন আর ক্যাপটেন মুখোমুখি বসে একটা গুপ্তধনের প্ল্যান দেখছে, টিনটিনের কুকুর কুট্টুস একটা ডাইনী বুড়িকে তাড়া করে অন্য কামরায় উঠিয়ে দিয়ে এল। একটা কামরার জানালায় দেখল, ভুতুম বসে আছে। কিন্তু ভুতুমের সঙ্গে ঝগড়া বলে তার দিকে ভাল করে তাকাল না বুরুন।

টিং টিং করে মিষ্টি ঘণ্টা বাজতেই গার্ডসাহেব হুইসল্ দিয়ে গাড়ি ছাড়ার সঙ্কেত দিলেন আর বুরুনের দিকে চেয়ে বললেন, "উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি!" গার্ডের মুখ দেখে বুরুন তো অবাক। এ যে অরণ্যদেবের সেই বেঁটে সঙ্গী গুরান!

একটা কামরায় উঠে পড়ে বুরুন। জানালায় বসে দেখে, রূপকথার দেশের মতো অলৌকিক সুন্দর এক দেশের ভিতর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। সব কিছুই ছোট-ছোট, সব কিছুই খুব সুন্দর রঙের।

যে কামরায় বুরুন উঠেছে, তাতে অজস্র পুতুল বসে-বসে বিস্কুট খাচ্ছে আর চিকন সুরে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। পুতুল কুকুর ঘুরে ঘুরে 'পুফ পুফ' করে ডাকছে, বাঘ-পুতুল বলছে 'হালুম হুলুম', হাতি-পুতুল একটা বানর-পুতুলকে শুঁড়ে নিয়ে দোল দিচ্ছে।

একটা জঙ্গলের ধারে গাড়ি এসে ছোট্ট একটা স্টেশনে থামল। স্টেশনের নাম 'চড়ুইভাতি'। গুরান এসে সবাইকে বলল, "নেমে পড়ো, নেমে পড়ো। এখানে আজ চড়ুইভাতি হবে।"

নেমে বুরুন সকলের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে থাকে। ভারি সভ্য-ভব্য জঙ্গল। কোথাও কাঁটাগাছ নেই, বিছুটি পাতা নেই। সুন্দর সুন্দর সব গাছ, ফুল, পাখি। ছোট ছোট বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার ঘুরে বেড়াচ্ছে। নানা রঙের সাপ চলেছে নিজের কাজে। তাদের দেখে একদম ভয় করে না। একটা বাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল বুরুন। একটা সাপকে তুলে একটু আদর করে ছেড়ে দিল।

দিনের আলো ফুরোচ্ছে না। সূর্য আটকে আছে পাহাড়ের পিছনে। আর সেই সুন্দর নরম আলোয় জঙ্গলের মধ্যে লুকোচুরি। আলোছায়ায় ডোনাল্ড ডাক, টিনটিন, গুরান, ডাইনী বুড়ি, পুতুল আর জীবজন্তু মিলে কী যে হই-হুল্লোড় করে চড়ুইভাতি হতে লাগল, তা বলে ফুরোয় না। ভুতুম এসে কাকুতি-মিনতি করে বলল, "বুরুনদা, কাল আবির দিয়ে খুব অন্যায় কাজ করেছি। আর হবে না, কান ধরছি।"

বুরুন গম্ভীর হয়ে বলে, "আর পিঁপড়ে?"

"সেও অন্যায়। এই দেখ, দশবার ওঠবোস করছি। এবার ভাব করবে তো?"

ভুতুমের এত ভাল স্বভাব হয়েছে দেখে খুশি হল বুরুন। ভাব করে ফেলল।

এত সুন্দর দেশ ছেড়ে আর কোথাও কখনো যাবে না বুরুন। মনে-মনে এ কথা সে ঠিক করে ফেলল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। বুরুন আর ভুতুমকে খুঁজতে যে সব লোককে চারদিকে পাঠানো হয়েছিল, তারা ফিরে এসে খবর দিল—নাঃ, কোথাও তাদের পাওয়া গেল না।

এ খবর শুনে মন্মথবাবু শয্যা নিলেন। আর রামবাবু ঘন-ঘন তামাক খেতে লাগলেন। দু' বাড়িতেই কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল।

সন্ধের শেষ ডাউন রেলগাড়িটা ইস্টিশান ছেড়ে চলে গেল। তার, কু-ঝিক-ঝিক শব্দ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই চারদিক কাঁপিয়ে বাঘের ডাক উঠল—ঘ্রা-আ-আ-ম্! এক বার। দু' বার। তিন বার। আর তখন চারদিকে হলুদ আলোর বান ডাকিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে পড়ল আকাশে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্নাতেও চারদিকটা আজ বড় ভুতুড়ে দেখাতে লাগল।

রাস্তাঘাট ফাঁকা, জনশূন্য। পথে কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত নেই। সব দরজায় খিল পড়ে গেছে। হাড় কাঁপানো শীতের বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

রাম কবিরাজ একা তাঁর দোকানঘরে বসে আছেন। আড্ডাধারীরা কেউ আজ আসেনি। চারদিক নিঃশব্দ। রাম কবিরাজ বসে বসে ভাবছেন আর তামাক খাচ্ছেন। ভাবতে-ভাবতে এক সময়ে হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলেন, "হুঁ। তাহলে এই হল ব্যাপার!"

যেই কথাটা বলেছেন, অমনি তাকের উপর শিশি-বোতলগুলো ঠুনঠুন করে নড়ে উঠল। রাম কবিরাজ অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। ভাবলেন, মনের ভুল। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হুঁ। তাহলে এই হল ব্যাপার!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার শিশি-বোতলের ঠুনঠুন শব্দ।

রাম কবিরাজ জানেন, ঘাবড়ে গেলে বা উত্তেজিত হয়ে পড়লে কোনও দিন কোনও কাজ হয় না। এমনিতেও তিনি ভিতু মানুষ নন। কারণ, যারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, তাদের ভয়ের কিছুই নেই। মনটাকে শক্ত করে তিনি ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন। জপ করতে করতেই বললেন, কী চাও?"

কপাটের আড়াল থেকে খোনা সুরে কে যেন বলে, "জপ বন্ধ করুন, নইলে কাছে আসি কী করে? আমার সময় নেই, কাজের কথাটা বলেই চলে যাব।"

রাম কবিরাজ জপ থামিয়ে বলেন, "এবার বলো।"

খোনাসুর কপাটের আড়াল থেকে ঘরের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু রামবাবু কাউকে দেখতে পান না। বাতাসের ভিতর থেকে স্বরটা বলে, "ভয় পাবেন না। আমরা সব বুরুনের বন্ধুলোক। আমার নাম খোনাসুর।"

"বুরুন কোথায়?"

"গোঁসাইবাগানের পাতালঘরে। সমুদ্রদিঘির দক্ষিণের ঘাটে জলের তলায় ছয় নম্বর সিঁড়ির গায়ে যে ফাটল আছে, সেইটেই হল সবচেয়ে সোজা রাস্তা। জলে ডুব দিয়ে ফাটলে ঢুকে দশ কদম হাঁটলেই পথ পাওয়া যাবে, যে পথ সোজা পাতালঘরে গেছে। সেখানে বুরুন আর ভুতুম দুজনেই আছে।"

"সেখানে যাওয়া যায় না?"

"তা যাবে না কেন? কৌশলে সব হয়। কিন্তু গিয়ে কিছু লাভ নেই। তারা সেখান থেকে আসতে চায় না।"
"সে কী?"

"আজ্ঞে সেই খবরটাই দিতে এলাম। হাবু তাদের বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে আটকে রেখেছে। আমাদেরও মন্ত্রের জোরে বশ করে দিনরাত খাটাচ্ছে। একটুও জিরোতে পাই না। গা-গতরে ব্যথা। তা কবিরাজমশাইয়ের কাছে গাব্যথার কোনো ওষুধ আছে নাকি?"

"আছে। তবে সে মানুষের জন্য। তোমাদের কি আর সে ওষুধে কাজ হবে?"

"তাহলে শিগগির শিগগির আমাদের জন্যও ওষুধপত্র বের করে ফেলুন।"

রাম কবিরাজ চিন্তিত হয়ে বললেন, "কাজটা বড় সহজ নয় হে। প্রথমে ভেবে দেখতে হবে, তোমাদের যখন শরীরই নেই, তখন অসুখটা হয় কোথায়। নাড়ীর গতি দেখে যে কিছু বুঝব তারও কিছু উপায় নেই। তারপর ধরো, তোমাদের পেট নেই, কাজেই ওষুধ পেটে গিয়ে ক্রিয়া করবে না। তোমাদের গায়ে মালিশও চলবে না। কাজেই তোমাদের জন্য বায়বীয় ওষুধ বের করতে হবে। সে কাজ ভারি শক্ত। তবে আমি চেষ্টা করব।"

খোনাসুর খুশি হয়ে বলে, "বড় উপকার হবে তাহলে কবিরাজ মশাই। আমাদের কথা তো কেউ ভাবে না। এই হাবু বদমাশটার কথাই ধরুন না। এখানে আসা ইস্তক কী অভৌতিক খাটানটাই না খাটাচ্ছে! বিছুটি-বন পরিষ্কার করো, কাঁটা-গাছ ওপড়াও, ঘর পরিষ্কার করো, দিঘির কচুরিপানা তোলো, এটা আনো, সেটা নিয়ে যাও, অমুককে খবর দাও, তমুককে ধরে আনো, কাজের শেষ নেই। তিন-ধা-নাচন নেচে মরছি। বাগে পেলেই হাবুর ঘাড় মটকাব।"

উৎসাহিত হয়ে রাম কবিরাজ বলেন, "সত্যি মটকাবে?"

"তবে আর বলছি কী? অবশ্য হাবুর ঘাড় মটকানো সহজ কাজ নয়। সে আমাদের মন্ত্রের জোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারি না। তা বলে ভাববেন না যেন, আমরা সবাই হাবুর হুকুম খুশি হয়ে তামিল করছি। সুযোগ বুঝলেই আমরা কাজে ফাঁকি দিই। এক লহমার কাজ করতে তিন দিন লাগিয়ে দিই, তিন দিনের কাজ সারতে তিন মাস কাটাই। আরবারে হাবুর কালীপুজোয় ফটিকবাবু চাঁদা দেননি বলে হাবু রেগে গিয়ে আমাকে ডেকে বলল, যা তো, ফটিকের গোঁফ জোড়া উপড়ে নিয়ে আয়। আমি করলুম কী, ফটিকবাবুর গোঁফের বদলে তাঁর ছাগলের দাড়িগাছটা ছিড়ে নিয়ে গেলাম। হাবু প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, পরে টের পেয়ে সে কী মার আমাকে! আমি মাথা চুলকে বললাম, আজ্ঞে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর পাইনি। তখন আরও মারে দেখে বললাম, আজ্ঞে কানে ভাল শুনতে পাচ্ছি না। বুড়ো হচ্ছি তো, তাই ফটিক শুনতে ফটিকের ছাগল আর গোঁফ শুনতে দাড়ি শুনেছি। কিন্তু মানুষের উপকার করতে নেই কবিরাজমশাই। এই যে ফটিকবাবুর একটা উপকার করেছিলাম, তার জন্য বরং ফটিকবাবুই উল্টে কত না শাপ-শাপান্ত করেছেন।

বলেছেন, যে-আমার ছাগলের দাড়ি ছিড়েছে তার ওলাউঠা হোক, সে নরকে যাক, নরকে যেন যমদূতেরা তাকে দশ হাজার বছর ধরে সেদ্ধ করে আরো দশ হাজার বছর ধরে ভাজে, তারপর আরও দশ হাজার বছর রোদ্দুরে ফেলে রেখে শুকোয়।"

কবিরাজমশাই সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "আহা, বুঝতে পারেনি ফটিক। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবখন। তুমি রাগ কোরো না বাবা খোনাসুর।"

এই বলে কবিরাজমশাই উঠে একটা কাগজের পুরিয়াতে একটু কর্পূর, গন্ধক, কালোজিরে, এলাচের গুঁড়ো, হিং এবং আরও কয়েকটা চূর্ণ মিশিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, "এটা নিয়ে যাও। গায়ে-গতরে ব্যথা হলে বা হাঁফিয়ে পড়লে শুঁকে দেখো। এক শিশি কবিরাজী নস্যও নিয়ে যাও, ওই তাকে আছে। এতে যদি কাজ হয়, তবে আমি ভূতদের জন্য আরও নানা রকম ওষুধ বানাতে শুরু করব। আর সেই নতুন চিকিৎসাবিদ্যার নাম দেব ভৌত আয়ুর্বেদ।"

বাতাসের হাত বাড়িয়ে খোনাসুর পুরিয়াটা তুলে নিল। কবিরাজ মশাই দেখলেন পুরিয়াটা শূন্যে ভাসছে। খুব জোরে একটা শ্বাস টানার শব্দ হল। তারপর এক প্রবল হ্যাচ্ছোঃ। খোনাসুর বলে ওঠে, "আঃ! খুব কাজ হচ্ছে মশাই। গায়ের ব্যথাটা যেন হাঁচির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। জব্বর ওষুধ।"

রাম কবিরাজ খুশি হয়ে বললেন, "ওষুধের জন্যে আর ভেবো না। লোকে আজকাল আর কবিরাজের কাছে আসতে চায় না, হাতুড়ে অ্যালোপ্যাথের দোরে গিয়ে ধরনা দেয়। সেইজন্য মানুষের চিকিৎসা করতে আর রুচি হয় না। এবার থেকে নাহয় ভূতেদের চিকিৎসা করে দেখব।"

খোনাসুর আর একবার হাঁচি দিয়ে বলল, "যে আজ্ঞে।"

রামবাবু গলায় আদর মাখিয়ে বললেন, "এবার বলো তো বাবা খোনাসুর, ছেলে দুটোকে উদ্ধার করি কোন উপায়ে?"

খোনাসুর ভয়-খাওয়া গলায় বলে, "ও বাবা! উদ্ধার করা বড় কঠিন কাজ কবিরাজমশাই। যদি বা কোনও রকমে উদ্ধার করতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারবেন না।"

রামবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, "তাহলে উপায়?"

"যদি কোনও রকমে বুরুন নিজের মনের জোর খাটিয়ে বশীকরণের মন্ত্র কাটাতে পারে, একমাত্র তবেই সে উদ্ধার পাবে। এ বাইরের লোকের কাজ নয়। যা করবেন ভেবেচিন্তে করবেন...হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁচ্ছো...আঃ, আপনার ওষুধে খুব কাজ হচ্ছে মশাই।"

রামবাবু পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, "তা আর হবে না! আমি হলাম ডাকসাইটে রাম কবিরাজ, মড়া বাঁচাতে পারি—"

কিন্তু কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই কবিরাজ মশাই টের পেলেন যে, পুরিয়া সমেত খোনাসুর সাঁ করে পালিয়ে গেল। রামবাবু বার বার ডাকাডাকি করেও আর তার সাড়া পেলেন না। "কী হল রে বাবা" বলে কবিরাজমশাই ভাবতে লাগলেন। তারপর তাঁর খেয়াল হল, অন্যমনস্কভাবে তিনি খোনাসুরের সামনে নিজের নামটা উচ্চারণ করে ফেলেছেন। ও নাম ওদের সহ্য হয় না। মনে মনে তিনি ঠিক করলেন, ভূতেদের চিকিৎসা যদি করতেই হয়—তবে ওদের সামনে নিজের নামটা ভুলেও মুখে আনা চলবে না।

করালীবাবু দোল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাতে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন। ভারি শক্ত একটা রুটওভার সকাল থেকে কয়বার চেষ্টা করছেন। পারেননি। পারবেন কী করে? সারাদিন গায়ের ছেলেবুড়ো হুল্লোড় করে রং খেলেছে। অত হুল্লোড়ে কি অঙ্ক হয়? অঙ্ক হয়নি বলে করালীবাবুর মাথাটা তেতে আগুন হয়ে গেল। প্রায়ই এরকম হয়। আর মাথা গরম হলে বরাবর, কী শীত কী গ্রীষ্ম, কী দিন কী রাত, করালীবাবু গিয়ে পুকুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলা অবধি ডুবিয়ে বসে থাকেন। আর এই অভ্যাসের ফলে করালীবাবু নিজের অজান্তেই খুব বড় সাঁতারু হয়ে গেছেন। ইচ্ছে করলে তিনি পাঁচ, সাত, এমন কি দশ মিনিট পর্যন্ত জলের নীচে ডুব দিয়ে থাকতে পারেন। বলতে কী, সাঁতারের কম্পিটিশনে নামলে করালীবাবুকে হারানোর মতো লোক নেই।

সে যাই হোক, করালীবাবুর রুটওভারের অঙ্কটা হয়নি আজ। সন্ধে অবধি পুকুরে ডুবে থেকে তাঁর মাথাটা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। রাস্তায় পায়চারি করতে করতে তিনি গোল চাঁদটার দিকে তাকিয়ে 'জিরো' সংখ্যাটার কথা ভাবছিলেন। আর এই ভেবে অবাক হচ্ছিলেন যে, জিরোর মতো এত রহস্যময় ব্যাপার আর কিছুই নেই। ভেবে দেখলে জিরো বা শূন্যই হচ্ছে সব সংখ্যার উৎস। পৃথিবীর যাবতীয় সংখ্যাতত্ত্বের মূলে রয়েছে ওই শূন্য।

চারদিকে বান-ডাকা জ্যোৎস্নায় গাছপালা, আকাশ, মাটি এই যে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, এর পিছনেও আছে একটা প্রোপোরশন বা অনুপাত। আকাশ কতটা পরিষ্কার থাকলে, কতখানি জ্যোৎস্না উঠলে কতগুলো গাছপালা এবং কতখানি মাঠ-ময়দান থাকলে কতটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি হবে, তার পিছনেও কি অঙ্ক নেই?

আসলে আকাশে, বাতাসে, জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে সর্বত্রই অঙ্কের প্রভাব। ভেবে ভারি মুগ্ধ হয়ে গেলেন করালীবাবু।

আর ঠিক এই সময়েই বাতাস ছিড়ে, জ্যোৎস্না কাঁপিয়ে ভয়ংকর এক বাঘের ডাক উঠল 'ঘ্রা-ড়া-ড়া-ড়া-ম্'! একবার। দুবার। তিনবার। 'বাঘ! বাঘ!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চারদিকে লোকজন দৌড়ে ঘরবাড়িতে ঢুকে পড়ছে। করালীবাবু একটু চমকালেন বটে, কিন্তু ঘাবড়ালেন না। শুধু আপনমনে বললেন, "সাউন্ড! সাউন্ড মিন্স ভাইব্রেশন। অ্যান্ড ভাইব্রেশন মিন্স এনার্জি।"

অনেক ভেবে কালীবাবু দেখলেন এই সুন্দর প্রোপোরশনেট জ্যোৎস্না-রাতের মধ্যে বাঘের ডাকের মতো একটা নতুন এনার্জি বা ভাইব্রেশন ঢুকে পড়ায় প্রোপোরশনটা নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ পূর্ণিমার সৌন্দর্যটা আর রইল না। মানুষ ভয় পেয়ে গেল। আচ্ছা, ভয়টাও কোনো এনার্জি? নাকি অ্যাবসেন্স অব এনার্জি?

বাড়ির লোকজন এসে করালীবাবুকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পুব আকাশের দিকে চেয়ে টকটকে লাল সূর্যটা দেখে করালীবাবু আবার শূন্য সংখ্যাটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। শূন্যকে গুণ করা যায় না, ভাগ করা যায় না, শূন্য থেকে কিছু বিয়োগ করা যায় না—সব সময়েই নিটোল শূন্য থাকে।

এইসব ভাবতে ভাবতে করালীবাবু স্নান করলেন, খেলেন, ইস্কুলে গেলেন।

ইস্কুলে আজ বিশাল হট্টগোল। ছেলেরা কেউ ক্লাসে যাচ্ছে না। ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ছে না। চারদিকে লোকজন খুব গম্ভীর মুখে কথাবার্তা বলছে। শোনা গেল, কাল থেকে ইস্কুলের দুটি ছেলে বুরুন আর ভুতুম নিরুদ্দেশ। কোথাও তাদের হদিশ মিলছে না। আবার গতকালই গঞ্জে বহুবার বাঘের ডাক শোনা গেছে। সকলে তাই দুইয়ে-দুইয়ে চার করে নিয়েছে। বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা, বুরুন আর ভুতুম এখন বাঘের পেটে। সুতরাং একদল ছাত্রের দাবি, বুরুন আর ভুতুমের নামে শোক-প্রস্তাব নিয়ে ইস্কুল ছুটি দেওয়া হোক। কেউ কেউ বলছে, ছেলেদুটোকে কোন দুষ্ট লোক চুরি করে নিয়ে গেছে। কেউ বলছে, তারা সমুদ্রদিঘিতে ডুবে গেছে।

সে যাই হোক, বুরুন নিরুদ্দেশ হওয়াতে করালীবাবু খুবই হতাশ হলেন। বুরুনের মতো ছাত্র তিনি জীবনে দেখেননি। যদিও গত বার্ষিক পরীক্ষায় বুরুন অঙ্কে তেরো পেয়েছিল, তবু ইদানীং অঙ্কে তার প্রতিভা দেখে করালীবাবুর দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, এ-ছেলে আইনস্টাইনের মতো বড় হবে। এরকম ছাত্র খোয়া গেলে কার না দুঃখ হয়? বুরুন তাঁকে একবার বলেছিল, "স্যার, অঙ্কের নিয়মে এক-এ এক-এ যোগ করে আমরা দুই করি, কিন্তু সেটা কি ঠিক? পৃথিবীতে কোনও একটা জিনিসই ঠিক আর একটার মতো নয়। একটা গাছের লক্ষ পাতার মধ্যে মিলিয়ে দেখলেও দেখা যাবে, একটা পাতা হুবহু আর একটার মতো হয় না, আকার গঠন রং ওজন ইত্যাদিতে কিছু না কিছু তফাত থাকবেই। এমন কি, এক কণা বালির সঙ্গেও আর-এক কণা বালির

তফাত আছে। কাজেই একের সঙ্গে এক যোগ করে দুই হয় না, কারণ দুটো এক তো আলাদা।” করালীবাবু খুবই অবাক হয়ে বলেছিলেন, “তাহলে কী হবে?” বুরুন জবাব দিয়েছিল, “এক-এর সঙ্গে এক যোগ করলে পাই দুটো এক। তেমনি তিনটে এক বা চারটে এক।”

এইটুকু বয়সে বুরুনের মাথায় এক-এর তত্ত্ব খেলতে দেখে করালীবাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। করালীবাবুও জানেন, বস্তুতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীতে কখনও দুটো জিনিস ঠিক একরকম হতেই পারে না। তাহলে এক-এর সঙ্গে এক যোগ করে দুই হয় কি করে? এই নিয়ে করালীবাবু প্রায়ই ভাবেন।

হেডস্যার শচীন সরকার মাস্টারমশাইদের ডেকে বললেন, “যতদূর মনে হচ্ছে হতভাগ্য ছেলেটিকে বাঘেই নিয়েছে। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কনডোলেন্স মিটিং করতে পারি না। তবে বাঘের উপদ্রবে ছেলেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে ইস্কুল ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারাও সতর্ক থাকবেন।”

হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে এত দুঃখেও করালীবাবুর মাথায় অঙ্ক খেলছিল। তিনি ভাবছিলেন, দুটো ছেলেকে যদি একটা বাঘে খায়, তবে একের সঙ্গে দুই যোগ হয়ে অঙ্কের নিয়মে হয় তিন। কিন্তু আদতে দুটো ছেলে প্লাস একটা বাঘ ইজ ইকুয়াল টু হয় একটা বাঘ। বুরুন, ভুতুম আর বাঘ মিলে তিনটে প্রাণী হয়নি। অঙ্কের নিয়ম এখানে ব্যর্থ। আরও দুঃখের কথা, বুরুনের মতো অঙ্কের ভাল ছাত্রকে খেয়ে ফেলেও বাঘটার অঙ্কের মাথা খোলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বাঘটা টেরই পাবে না—সে অঙ্কের জগতের কত বড় একটা প্রতিভাকে ধ্বংস করেছে।

আবেগে করালীবাবুর চোখে জল এল। রাগে তাঁর গা ফুলতে লাগল। আপনমনে তিনি বললেন, “বাঘটাকে নিকেশ করতেই হবে।”

গেম টিচার পাশেই বসে ছিলেন। করালীবাবুর কথাটা তাঁর কানে যেতেই তিনিও চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, “বুরুনের ওপর আমার অনেক আশা ছিল। অলিম্পিক থেকে তার অন্তত দশ বারোটা সোনার মেডেল আনার কথা। বদমাশ বাঘটাকে নিকেশ করার কথা আমিও অনেক ভেবেছি। কিন্তু শুনছি সেটা নাকি কোন তান্ত্রিকের বাঘ, সে তান্ত্রিক আবার মন্ত্র-তন্ত্র বশীকরণ জানে।”

করালীবাবু অঙ্ক আর বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই মানেন না। তাই হা-হা করে হেসে বললেন, “কিছু ভাববেন না। আমাকে একটা মজবুত দেখে লাঠিসোটা যা হোক কিছু দিন তো! তারপর দেখবেন এনার্জি মোমেন্টাম আর ভেলোসিটির কাছে সব মন্ত্রতন্ত্র ধুলো হয়ে যাবে।”

গেম স্যার খুশি হয়ে বললেন, “সে আর বেশি কথা কী? জ্যাভেলিনটাই নিয়ে যান। বল্লমকে বল্লম, লাঠিকে লাঠি।”

তাই হল। ছেলেরা যখন যে যার বাড়ি গেল, রাস্তাঘাট যখন একটু নির্জন হল, তখন জ্যাভেলিনটা কাঁধে ফেলে করালীবাবু হন হন করে গোঁসাইবাগানের দিকে রওনা হলেন।

রাম কবিরাজ দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন। বাড়ির লোকেরা সব প্রবল কান্নাকাটি করছে। তিনিও কোনও উপায় বের করতে পারছেন না। বুরুন গোঁসাইবাগানের পাতালঘরে আছে। সেখানে পৌঁছানো শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। খোনাসুর শর্টকাট রাস্তা বলে দিয়ে গেছে। যে-কোনও ভাল সাঁতারুর পক্ষেই সেখানে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু মুশকিল হল, বুরুনের ভিতরে মনের জোর সৃষ্টি করা। বুরুনের ইচ্ছাশক্তি না জাগলে সে মন্ত্র কাটিয়ে বেরোতে পারবে না।

ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেছেন কবিরাজমশাই। চোখের কোলে কালি।

হঠাৎ রাস্তা দিয়ে করালীবাবুকে একটা বল্লম কাঁধে হেঁটে যেতে দেখে রামবাবুর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। তিন লাফ দিয়ে দাওয়া থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে গিয়ে করালীবাবুর কাছা টেনে ধরে বললেন, "করালীবাবু! চললেন কোথায়?"

করালীবাবু বুরুনের দাদুকে দেখে ব্যথিত মুখ করে বললেন, "বুরুনের জন্য আমরা সবাই দুঃখিত রামবাবু। আমি বাঘটাকে শিক্ষা দিতে যাচ্ছি।"

রামবাবু খুশি হয়ে তাঁর বিচক্ষণ চোখ দিয়ে কালীবাবুর চেহারাটা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "আপনার বীরত্বে ভারি আনন্দ পেলাম। যাওয়ার আগে দয়া করে আমার একটা পাঁচন খেয়ে যান, তাতে গায়ে বল হবে। আর সেই সঙ্গে দুটো-একটা গোপন শলা-পরামর্শও দিয়ে দেব। সব সময়ে বীরত্বে কাজ হয় না, কৌশলও চাই।"

এই বলে করালীবাবুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন রামবাবু।

অনেকক্ষণ তাঁদের শলা-পরামর্শ চলল।

সন্ধের পর আজও শেষ ডাউন গাড়ি ইস্টিশান ছেড়ে কু-ঝিক-ঝিক শব্দ তুলে চলে গেল। একটু বাদেই প্রতিপদের চাঁদ একগাল হাসি ছড়িয়ে আকাশে উঠে পড়ল। একপাল শেয়াল চেঁচিয়ে উঠল কোথায় যেন, আর সেই শব্দে পাড়ার কুকুরগুলো ধমক-ধামক শুরু করে দিল। আর হঠাৎ এ-সময়ে করুণ সুরে ডেকে উঠল ফেউ। সবাই জানে ফেউ হল বাঘের সঙ্গ। ফেউয়ের ডাক মিলিয়ে যেতে না যেতেই 'ঘ্রা-আ-ড়া-ড়া-ম্' ডাকে কেঁপে উঠল চারদিক। সেই শব্দে সন্ধে-রাতেই লোকালয়ে নিশুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে। যে যার ঘরে বসে প্রাণভয়ে কাঁপে।

শহরের দক্ষিণ পারে ভয়ংকর গোঁসাইবাগানের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছেন করালী স্যার। কাঁধে জ্যাভেলিন। রাম কবিরাজ করালীবাবুর গায়ে একটা ভারি দুর্গন্ধ তেল মাখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, শীতের রাতে ঠাণ্ডা জলে নামতে আর ভয় রইল না। এ ভারি দুষ্প্রাপ্য তেল। এটা মেখে দক্ষিণ মেরুতে গেলেও নিউমোনিয়া ধরবে না। তা, তেলটা বোধহয় ভালই হবে, কিন্তু ভারি বিশ্রী গন্ধ। কবিরাজমশাই করালীবাবুকে খানিকটা পাঁচনও খাইয়ে দিয়েছেন। সে পাঁচনটাও খেতে বিশ্রী। কিন্তু সেটা খাওয়ার পর থেকে মনটায় খুব ফুর্তি পাচ্ছেন করালীবাবু, আর মাথাটাও ঠাণ্ডা রয়েছে।

নিঃশব্দে সমুদ্রদিঘির ধারে এসে পৌঁছলেন করালী স্যার। একটা বাঁশঝোপের আড়ালে ছায়ায় দাঁড়িয়ে চারিদিকটা একটু হিসেব করে নিলেন। চারদিক ছমছম করছে। জ্যোৎস্নার মুখে যেন একটা ভুতুড়ে কুয়াশার তুলি। চারপাশে যেন ছায়া-ছায়া অশরীরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু ভয়-ভয় করল করালীবাবুর। মনে-মনে একটা

রুটওভার করে ফেলতেই ভয়টা কেটে গেল। দিঘিটা সমুদ্রের মতোই বিশাল বটে। কিন্তু তাঁকে অতটা পার হতে হবে না। কবিরাজমশাইয়ের কথামতো ঠিক নিশানায় হেঁটে তিনি পশ্চিম দিকের ধারে চলে এসেছেন। এখান থেকে দক্ষিণের ঘাটে স্থলপথে যাওয়া আর নিরাপদ নয়। যেতে হবে জলে নেমে সাঁতরে। করালীবাবু হিসেব করে দেখলেন, এখান থেকে আগাগোড়া ডুব-সাঁতারে যেতে কম করে বিশ মিনিট লাগবে। কিন্তু তাতে ঘাবড়ালেন না মোটেই। শুধু জলে নামার আগে বাঁশঝাপের আড়ালে বসে মনে-মনে খুব শক্ত একটা ইকোয়েশন কষে ফেললেন।

তারপর জামা কাপড় খুলে শুধু একটা হাফপ্যান্ট-পরা অবস্থায় বাঁশঝোপের ছায়া থেকে সাপের মতো বুকে হেঁটে জ্যাভেলিন সমেত নিঃশব্দে জলে নেমে গেলেন করালীবাবু।

একটু শীত ছিল বটে, কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। তবে অসুবিধে হচ্ছিল জলের তলাটা অন্ধকার বলে। কোনদিকে যাচ্ছেন, ঠিক নিশানায় এগোচ্ছেন কিনা তা বুঝতে পারছিলেন না। তবু নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ টের পেলেন, তাঁর আশেপাশে খুব বড় বড় ডুবোজাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আতঙ্কে হিম হয়ে গেল তাঁর গা। সর্বনাশ! শত্রুপক্ষের যে ডুবোজাহাজ আছে, তা তো জানা ছিল না! তাড়াতাড়ি ভেসে উঠলেন করালীবাবু। আকাশে চাঁদের দিকে চেয়ে দশ লক্ষ দশ হাজার দশকে তিন লক্ষ তিন হাজার তিন দিয়ে ভাগ করে ফেললেন মনেমনে। মনটা ভাল হয়ে গেল। ভাল করে চারদিকে চেয়ে দেখলেন, দক্ষিণের ঘাটে যেতে এখনও বেশ খানিকটা পথ বাকি। জ্যাভেলিনটা বাগিয়ে ধরে আবার ডুব দিতেই ভুল ভাঙল। ডুবোজাহাজ বলে যেগুলোকে ভেবেছিলেন, সেগুলো আসলে সমুদ্রদিঘির বিখ্যাত কালবোশ, চিতল, বোয়াল, কাতলা আর পাকা রুই মাছ। এ-দিঘির মাছ কেউ ভয়ে ধরে না, তাই বহুকাল ধরে বেড়ে-বেড়ে মাছগুলোর চেহারা হয়েছে পেল্লায়, গায়ে শাওলা জমে গেছে।

আর একবার দম নিতে উঠে ফের ডুব দিতেই করালীবাবু একেবারে মুখখামুখি দেখেন, এক বিকট মূর্তি বিশাল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিকট দাঁত দেখিয়ে হাসছেও। করালীবাবু জ্যাভেলিন বাগিয়ে ধরে মনে-মনে আর একটা ইকোয়েশন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভয়ে কিছু মনেই পড়ল না। বিকট মূর্তিটা জ্যাভেলিন বাগানো দেখেও ভয় খায়নি, হাত-পা ছড়িয়ে হাসছে। কিন্তু একটুও নড়েনি। করালীবাবু সাহস পেয়ে আর-একটু কাছে এগিয়ে দেখেন, ও হরি! এ যে সদ্য বিসর্জন-দেওয়া একটা কালীমূর্তি! এখনো কাঠামো থেকে মাটি বা রঙ খসেনি ভাল করে।

তিন নম্বর শ্বাস নিয়ে দম ধরে করালীবাবু দক্ষিণের ঘাট বরাবর পৌঁছে খুব সন্তর্পণে যেই আর-একবার শ্বাস নেওয়ার জন্য মাথা তুলেছেন অমনি খুব কাছেই বাজ-ডাকার মতো বাঘ ডাকল 'ঘ্রা-ড়া-ড়া-ম্-ম্!"

সেই ডাকে খানিকটা অবশ হয়ে গিয়ে ডুব দিতে ভুলেই গেলেন করালীবাবু। খোলামেলা ঘাটের কাছে, জ্যোৎস্নায় বোকার মতো মাথা উঁচু করে রয়েছেন। হঠাৎ ঘাটের পৈঠায় এক বিশাল চেহারার মানুষের ছায়া দেখা গেল। লোকটা হুংকার দিয়ে বলে উঠল, "কে রে?"

করালীবাবু টুপ করে ডুব দিলেন। আসলে নিজের ইচ্ছেয় যে ডুব দিলেন তা নয়, মনে হল কে যেন তার ঠ্যাং ধরে জলের নীচে টেনে নিয়ে ছেড়ে দিল। ভাগ্যিস টানল! নইলে তাঁর শরীর এমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ডুব দেওয়ারও ক্ষমতা ছিল না।

জলের নীচে ছয় নম্বর ডুবো সিঁড়িটা খুঁজতে আরও কিছু সময় লাগত। কিন্তু মজা হল, করালীবাবু ডুববার সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন তাঁর হাতের জ্যাভেলিনটা ধরে খুব আস্তে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ফাটলের মুখে ছেড়ে দিল।

কী হচ্ছে, ধরা পড়ে গেছেন কিনা, তা বুঝতে পারছিলেন না করালীবাবু। কিন্তু ভাববার সময় নেই। মনে মনে একটা সহজ ফ্যাক্টর কষে নিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে কয়েক কদম হাঁটতেই একটা পথ পেলেন: এখানে জল কোমর-সমান। পথটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে, ঘোর অন্ধকারেও হাতড়ে হাতড়ে বুঝলেন।

খুব দূর থেকে একটা সোরগোলের আওয়াজ আসছে। ওরা কি তবে টের পেল?

সময় নেই। করালীবাবু জ্যাভেলিন হাতে অন্ধকারে পথটা বেয়ে উঠে গেলেন। নিখাদ অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ। পদে পদে নুড়ি পাথর, শ্যাওলা, ঘুমন্ত ব্যাঙ পায়ের নীচে টের পাচ্ছেন। একটা সাপকেও কি মাড়ালেন? কে জানে! তবে করালীবাবু এগিয়ে গেলেন ঠিকই। অন্ধকারে ক্যালকুলেশন চলে না বলে বারকয়েক আছাড়ও খেলেন। তবু এগোলেন। বেশি দূর যেতে হল না। পাঁচ-নম্বর আছাড়ের পর সোজা গিয়ে একটা দরজায় সজোরে ধাক্কা খেয়ে "বাবা রে" বলে বসে পড়লেন।

কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই। হাতড়ে দেখেন দরজার গায়ে পুরনো তালা ঝুলছে। এক মুহূর্ত চিন্তা না করে জ্যাভেলিনের ফলাটা তালার ভিতরে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই মরচে-ধরা তালা হড়াক করে খুলে গেল।

ঘরের ভিতর কোনও আলো ছিল না, তবে অনেক ওপরের একটা বড় ঘুলঘুলি দিয়ে পুরো চাঁদটা দেখা যাচ্ছে। আর চাঁদটা ঠিক টর্চের মতো ফোকাস ফেলেছে সোজা বুরুনের মুখের ওপর। করালীবাবু দেখেন, একটা চটের বিছানায় পাশাপাশি বুরুন আর ভুতুম শুয়ে ঘুমোচ্ছে। খুব শান্ত মুখ, মুখে একটু হাসি, তবে আবছা আলোতেও বোঝা যায়, ওরা খুব দুর্বল। একটুও নাড়াচাড়া বুঝি সইবে না। দু'দিনেই রোগা হয়ে গেছে ছেলে দুটো।

বুরুনকে একটা কথা বলতে হবে। রাম কবিরাজ কথাটা বারবার শিখিয়ে দিয়েছেন করালীবাবুকে। কিন্তু কথাটা এতই সামান্য, এতই ছেলেমানুষী যে, সে কথাটা বুরুনকে বলার কোনও মানেই হয় না। অথচ রামবাবু বারবার তাঁকে বলে দিয়েছেন যে, এই বাক্যটা নাকি বুরুনের পক্ষে মন্ত্রের মতো কাজ করবে। কবিরাজমশাই বিচক্ষণ মানুষ। তাঁর ওপরে কথাও চলে না।

কথাটা বলার জন্য করালীবাবু আস্তে আস্তে বুরুনের শিয়রের কাছে এগিয়ে গেলেন। হাঁটু গেড়ে বসলেন। খুবই সোজা কথা। কবিরাজমশাই বলে দিয়েছেন, একটু চেঁচিয়ে নামতার সুরে কথাটা বার কয়েক আওড়াতে হবে। কবিরাজমশাই বারবার জিগ্যেস করেছিলেন, "কথাটা মনে থাকবে তো কালীবাবু? ভুলে যাবেন না তো? যতই সামান্য শোনাক, এ-কথাটা কিন্তু বুরুনের বেঁচে থাকার পক্ষে খুব জরুরি।"

ফুঁ! তখন হেসেছিলেন করালীবাবু। এর চেয়ে কত শক্ত শক্ত কথা তার মনে থাকে। আর এ তো কোনও কথাই নয়। জলের মতো সোজা একটা বাক্য। নামতার সুরে বলতে হবে।

ঘরের বাইরে হঠাৎ খুব কাছেই আবার 'ঘ্রা-ড়া-ড়া-ড়া-হু-উ-ম্' করে ডাক শোনা গেল, আর একটা ধীর ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল।

সময় নেই, করালীবাবু বুরুনের কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চেঁচিয়ে কথাটা বলতে গিয়েই বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলেন। কথাটা তাঁর একদম মনে নেই! বেমালুম ভুলে গেছেন।

'ঘ্রা-ড়া-ড়া-ড়া—হু-উ-ম্' আবার ডাকল বাঘটা। এবার খুব কাছেই। পায়ের শব্দটাও এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে।

করালীবাবু নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলছেন রাগে। কথাটা কিছুতেই মনে পড়ছে না যে...হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা শব্দ ছিল...অঙ্ক...আর একটা যে কী যেন...তেরো...তেরো...হ্যাঁ...

ওদিকে আর একটা দরজা। সেই দরজার লোহার হুড়কো খোলার শব্দ হচ্ছে।

করালীবাবুর হাতের খামচায় একগোছা চুল তাঁর মাথা থেকে উপড়ে এল। ...তেরো...তেরো... তেরো... নামতার সুরে... বুরুন...বুরুন...বুরুন...

দরজার পাল্লাটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একটা মশালের হলুদ আলো দেখা দিল দরজার ফাঁকে। এক মস্ত চেহারার রক্তাম্বর-পরা লোক পাথরের মতো মুখে মশাল উঁচুতে তুলে ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। তার পিছনে বিশাল ডোরাকাটা কালো-হলুদ বাঘ।

করালীবাবুর অবশ হাত থেকে জ্যাভেলিনটা পড়ে গেল মেঝেয়। বিস্ময়ে হাঁ করে আছেন, মাথাটা ফাঁকা।

বাঘটা ডাকল—ঘ্র-ড়্-ড়্-অ...

কী সাংঘাতিক রক্ত-জল-করা ডাক!

করালীবাবু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। যেতেনই, তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে পুরো বাক্যটা মনে পড়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে করালীবাবু পাঠশালার সদার-পোড়োর মতো বিকট সুরে চেঁচাতে লাগলেন, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি..."

পাথরের মতো বিশাল চেহারার লোকটা এগিয়ে আসতে-আসতে হুঙ্কার দিল, "মা! মা গো! নর-রক্ত চাস মা? শব-সাধনা চাস মা? আজ তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

করালীবাবু সব ভুলে গেছেন, নিজের নামটাও মনে নেই। কিন্তু তিনি একনাগাড়ে নিখুত নামতার সুরে প্রাণপণে বলেই চলেছেন, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো..."

"ঘ্রা-ড়া-ড়া-ড়া-হু-উ-ম্!"

"তারা! তারা! মা!"

"ঘ্রা-ড়া-ড়া-হু-উ-ম্!" বলে আর একবার ডাক ছেড়ে বাঘটা বিদ্যুৎ-বেগে লাফিয়ে পড়ল সামনে।

করালীবাবু শুধু টের পেলেন যে, বাঘটা তাঁর প্যান্টের কোমর কামড়ে ধরে পুঁটিমাছের মতো মুখে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর সেই বিশাল লোকটা হুঙ্কার দিয়ে বলছে, "তারা! তারা!"

করালীবাবু বাঘের মুখ থেকে ঝুলে থেকেও প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বলে যেতে লাগলেন, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি..."

ছোট্ট একটা খেলনা-অ্যারোপ্লেনে করে বুরুন আর ভুতুম চাঁদের রাজ্যে চলে এসেছে। ভারি সুন্দর সোনালি মাঠ এখানে। সোনালি গাছপালা, সোনা রঙের ঘাস, আকাশে সোনা-ছড়ানো আলো।

চাঁদের বুড়ি চরকা থামিয়ে তাদের জন্য পিঠে বানাতে বসেছে। বুরুন আর ভুতুম চলল ততক্ষণে কাছের ছোট একটা রুপোলি পাহাড়ের জলে স্নান করতে।

চারদিকে পাখি ডাকছে। ময়ূর উড়ে বেড়াচ্ছে। মেঘের ভেলায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। চারদিকে খেলা, ম্যাজিক, চড়ুইভাতি, সাকাস, আইসক্রিম। পড়াশুনোর বালাই নেই, ইস্কুল-পাঠশালা নেই। শুধু মজা আর মজা!

ভুতুম বলল, "বুরুনদা, আমরা কিন্তু কোনও দিন ফিরে যাব না!"

"দুর! কে ফিরবে?"

বুরুন আর ভুতুম ম্যাজিক দেখল, সার্কাস দেখল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, আইসক্রিম খেতে খেতে গিয়ে ঝরনার জলে ইচ্ছেমতো স্নান করল, ঝরনার নীচে একটা সুন্দর পুকুরে সাঁতার কাটতে লাগল।

হঠাৎ বুরুন শুনতে পেল, এত আনন্দ আর অফুরন্ত মজার মধ্যে কে যেন হঠাৎ রসভঙ্গ করে বলে উঠল, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো।"

দপ করে যেন চারদিকের আনন্দের আলোটা নিবে গেল বুরুনের চোখে। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। চারদিকে চেয়ে কথাটা কে বলল, সে তা খুঁজছিল। সন্দেহবশে একটা পাখিকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিল বুরুন। কিন্তু তবু কে যেন আবার বলে উঠল, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো!"

ভারি রেগে গেল বুরুন। ভীষণ চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হবে না বলছি!"

কিন্তু আবার আড়াল থেকে, আবডাল থেকে, বাতাস থেকে, আকাশ থেকে কথাটা আসতেই লাগল, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো!"

রাগে বুরুন দশখানা হয়ে গেল। এক লাফে ঝরনার জল থেকে উঠে বড় বড় ঢিল তুলে চারদিকে ছোঁড়ে আর চেঁচায়, "ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! সব ভেঙে ফেলব! সব নষ্ট করে দেব!"

পায়ের নীচে মাটি বলে উঠল, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো!"

পাহাড় বলে ওঠে, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো!"

তারপর সমস্বরে গাছপালা, পাখি, নদী, জল, চাঁদ, মেঘ সবাই নামতার সুরে বলতে থাকে, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি..."

রাগের চোটে বুরুন একটা গাছ উপড়ে নেয়! তারপর দু'হাতে ধরে এলোপাতাড়ি চারদিকের সব কিছু ভাঙতে থাকে। আকাশ ভাঙে, পাহাড় ভাঙে, মাটি ভাঙে... ভাঙতে... ভাঙতে...ভাঙতে...চারদিকের সব ফাঁকা হয়ে যায়।...সব মিলিয়ে যায়।

পাতালঘরে আস্তে বুরুন চোখ মেলে তাকায়। তাকিয়েই বুঝতে পারে, তার ওপর এতক্ষণ যে স্বপ্নের ভার চাপানো ছিল, তা সরে গেছে!

তার কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলে ওঠে, "বুরুন, এই প্রথম একজন নিজের শক্তিতে হাবুর মন্ত্র কেটে বেরিয়ে আসতে পারল। সাবাশ! হাবুর আর কোনও ক্ষমতাই রইল না। যেই মুহূর্তে হাবুর মন্ত্র তুমি কেটেছ, সেই মুহূর্তেই হাবুর সব শক্তি চলে গেছে।"

বুরুন বলল, "নিধিদা!"

কিন্তু নিধিরাম তখন কোথায়! পলকে বাতাসের বেগে সে ছুটে গেছে তার দলবলকে খবর দিতে।

সুড়ঙ্গ ধরে মশাল-হাতে হাবু উঠছিল ওপরে। সামনে ভয়াল বাঘ। বাঘের মুখে করালীবাবু ঝুলছেন। ঝুলতে ঝুলতে তখনও অস্ফুট স্বরে বলছেন "বুরুন, তুমি...

হঠাৎ বাঘটা থেমে করালীবাবুকে যত্নের সঙ্গে মাটিতে শুইয়ে দিল। তারপর আস্তে-আস্তে ঘুরে হাবুর মুখখামুখি দাঁড়িয়ে বিশাল হাঁ করে গম্ভীর স্বরে ডাকল, "ঘ্রা-ড়া-ড়া-হু-উ-ম্!"

বাঘের দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে, জিভ দিয়ে নাল গড়াচ্ছে, গোঁফজোড়া কাঁটার মতো খাড়া হয়ে আছে।

আর সেই মুহূর্তে বাতাসে প্রচণ্ড কোলাহল করে ভূতেরা বলে উঠল, "হাবু, তুমি এবার মরো! হাবু, তুমি এবার মরো! হাবু, তুমি এবার মরো!" হুবহু করালীবাবুর নামতার সুর।

এক মুহূর্ত থ' হয়ে থেকে পরমুহূর্তেই হাবু বুঝতে পারল, তার মন্ত্র আর কাজ করছে না। যাদের সে বশ করে রেখেছিল এতকাল, তারা সব রুখে দাঁড়িয়েছে।

হাবুর জীবনে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। গদাই-দারোগার হাতে সে একবার বোকা বনেছিল বটে, কিন্তু তা বলে গদাই তার মন্ত্র কাটতে পারেনি। সাকাসের বাঘ ধরে এনে সাহসী গদাই তার পিঠে চেপে গোঁসাইবাগানে

এমনভাবে দেখা দিয়েছিল যে, হাবু ভেবেছিল গদাই বুঝি বেজায় মন্ত্রসিদ্ধ গুণী লোক। ঘাবড়ে গিয়ে হাবু বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল, তাই তার মন্ত্রতন্ত্র কাজ করেনি। কিন্তু তারপর জেলখানায় বসে গোপনে সে আরও চর্চা করে খুব ক্ষমতা নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সব গুলিয়ে গেল। আর কোনও জারিজুরি খাটবে না।

মুহূর্তের মধ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে হাবু মশালটা বাঘের মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড়তে লাগল। পিছনে তাড়া করে চলল ছ্যাঁকা-খাওয়া কালান্তক বাঘ। বাঘের পিছনে ভূতের পাল। আর তার পিছনে হাফপ্যান্ট-পরা মশাল হাতে করালী স্যার।

করালী স্যার তখনও চেচাচ্ছেন, "বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো..."

হাবু কিন্তু সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যায়।

করালী স্যারের হাফপ্যান্ট-পরা কাল চেহারা আর 'বুরুন, তুমি অঙ্কে তেরো...' চেঁচানি শুনেই বোধহয় বাঘটা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। হাবু প্রাণভয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা বাবলা গাছের শেকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। ভূতেরা যখন গিয়ে তার ঘাড় মটকানোর চেষ্টা করছে, তখন করালী স্যার "বুরুন, তুমি..." বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সেখানে হাজির হলেন। তাঁর গায়ে কবিরাজমশাই যে তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই তেলের গন্ধে অধিকাংশ ভূতই তফাতে গিয়ে 'ওয়াক' তুলতে লাগল, বাদবাকি ভূতেরা 'বুরুন তুমি...' চেঁচানিকে নতুন কোনও মন্ত্র ভেবে ভয় খেয়ে সরে দাঁড়াল।

তাই বেঁচে গেল হাবু। তবে বেঁচে গিয়েও তার হেনস্থার আর শেষ রইল না। ইস্কুলের বুড়ো দফতরি রিটায়ার হয়ে দেশে চলে যাওয়ায় সে-জায়গায় হাবুকে বহাল করা হল।

হাবু এখন ইস্কুলের ঘণ্টা বাজায়, ক্লাসে ক্লাসে পরীক্ষা বা ছুটির নোটিস দিয়ে যায়। সেই হাবু আর নেই। চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। ভূত-প্রেতকে সাঙ্ঘাতিক ভয়, দিনরাত রাম-নাম জপ করে।

কবিরাজমশাইয়ের যা পসার হয়েছে, তা আর বলার নয়। সারাক্ষণ তাঁর দোকানে রুগির ভিড়। তবে লোকে বলে যে, তাঁর রুগিদের মধ্যে সবাই মানুষ নয়।

খেলাধূলা বা লেখাপড়ায় বুরুনকে আর নিধিরাম সাহায্য করে না। রাম কবিরাজ নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে বুরুন নিজের চেষ্টাতেই খেলা ও পড়ায় বেশ উন্নতি করে ফেলেছে। তবে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষাতেও দেখা গেল যে, সে অঙ্কে সেই তেরোই পেয়েছে। অথচ একশ নম্বরের উত্তর নির্ভুল দিয়েছিল।

পরে অবশ্য খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, করালীবাবু স্যার ক্লাসের সব ছেলেকেই অঙ্কে ঢালাও তেরো নম্বর করে দিয়েছেন। কাউকে পাশ করাননি।

ছেলেরা গিয়ে যখন তাঁকে ধরল, তখন তিনি একগাল হেসে সকলের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "তেরো নম্বরটা খুব পাওয়ারফুল। বুঝলে! আমি এখন তেরো সংখ্যাটা নিয়ে খুব ভাবছি। ভেবে মনে হল, সকলেরই জীবনে অন্তত একবার অঙ্কে তেরো পাওয়াটা খুব দরকার।